ভারত ও ভূমণ্ডল

প্রথম পর্যায়

ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য



শ্রীউপেন্দ্র নাথ রায় এম.এ.,বি.টি

ও

৺সুরেন্দ্র কুমার চক্রবর্ত্তী বি.এস-সি

মূল্য টা. ৩·৩০

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের ১৯৭৪ খ্রীস্টাব্দ হইতে প্রবর্তিত নূতন পাঠ্যসূচী অনুসারে লিখিত।

ভারত ও ভূমণ্ডল

—ঃ প্রথম পর্যায় ঃ—

(পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ ও ত্রিপুরা)

ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব পরীক্ষক, কালীহাতী (ময়মনসিংহ)
উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব প্রধান শিক্ষক ও ২৪ পরগনা
জেলার অন্তর্গত কেওড়াতলা শরৎচন্দ্র মেমোরিয়াল
উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক

শ্রীউপেন্দ্রনাথ রায় এম্. এ., বি. টি.

ও

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব পরীক্ষক, মহারাজা
কাশিমবাজার পলিটেক্‌নিক ইন্‌স্টিটিউটের
ভূতপূর্ব প্রধান শিক্ষক

৺সুরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী বি. এস্-সি.

ইস্টার্ন পাবলিশার্স
৮-সি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রকাশক :
শ্রীশেফালিকা রায়
ইস্টার্ন পাবলিশার্স
৮-সি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০০০৯

দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৭৪

মুদ্রাকর :
শ্রীঅবনীকুমার দাস
লক্ষ্মীশ্রী মুদ্রণ-শিল্প
৪৫, রাজা রামমোহন সরণী
কলিকাতা ৭০০০০৯

নিবেদন

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা-পর্ষৎ কর্তৃক নির্ধারিত ষষ্ঠ শ্রেণীর ভূগোলের নূতন পাঠ্যসূচী অনুসারে লিখিত "ভারত ও ভূমণ্ডল" (প্রথম পর্যায়) প্রকাশিত হইল। এই পুস্তকে নূতন পাঠ্যসূচীর অন্তর্গত বিষয়গুলির নির্ভুল ও প্রাঞ্জল বর্ণনার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইয়াছে এবং বিষয়-গুলি যাহাতে বালক-বালিকাদিগের মনে রাখিবার পক্ষে সুবিধাজনক হয় তজ্জন্য স্থানে স্থানে প্রয়োজনীয় চিত্র ও মানচিত্র দেওয়া হইয়াছে। "ভারত ও ভূমণ্ডল"-এর বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করা হয় নাই। পুস্তকখানি শিক্ষার্থিগণের আশানুরূপ ফলপ্রদ হইলে শ্রম সার্থক মনে করিব। ইতি

কলিকাতা
১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৭৩

বিনীত
গ্রন্থকার

WEST BENGAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

77/2, PARK STREET, CALCUTTA—700016

REORGANISED PATTERN OF SECONDARY EDUCATION

FROM 1974

SYLLABUS IN GEOGRAPHY

CLASS—VI 80 Pages.

(60 pages—reading matter and 20 pages maps, charts, diagrams, photographs etc.) Size 22" × 32" 1/16 and Pica type.

1. The inhabitants of West Bengal—Their food, dress, shelter and occupation : Land forms including mountains, plateaus and plains, soil, rivers and climate. Products—forest, agriculture, livestock, fish, Minerals and Industries (60 pages).
2. A brief outline of the land, people and products of (a) Tripura, (b) Bangladesh (20 pages).

সূচীপত্র

পশ্চিমবঙ্গ

বাংলাদেশ

বিবিধ অনুশীলনী

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নাবলী

পূর্বাভাষ

আমরা পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী। ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই আগস্ট ভারতের স্বাধীনতা লাভের সময় ভারতবর্ষ দুইভাগে বিভক্ত হয়। এক ভাগের নাম ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র বা ভারত, অপর ভাগের নাম পাকিস্তান। ভারত বিভাগের ফলে সমগ্র বঙ্গদেশও দুইভাগে বিভক্ত হয়। এক ভাগের নাম পশ্চিমবঙ্গ, অপর ভাগের নাম পূর্ববঙ্গ বা পূর্ব পাকিস্তান। বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

১৯৫০ খ্রীস্টাব্দে ভারত সার্বভৌম স্বাধীন গণতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত হয়। বর্তমানে ২১টি রাজ্য ও ৯টি অঞ্চল লইয়া ভারত যুক্তরাষ্ট্র গঠিত। রাজ্যগুলি রাজ্যপাল শাসিত এবং অঞ্চলগুলি কেন্দ্র-সরকারের শাসনাধীন। আমাদের পশ্চিমবঙ্গ একটি রাজ্যপাল শাসিত রাজ্য।

১৯৫৬ খ্রীস্টাব্দে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী বিহারের পুরুলিয়া ও পূর্ণিয়া জেলার কিছু অংশ পশ্চিম দিনাজপুর জেলার অন্তভুক্ত হয়। ফলে পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাংশের সহিত দক্ষিণাংশের সংযোগ স্থাপিত হয়।

সীমা, আয়তন ও লোকসংখ্যা—পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের উত্তরে সিকিম ও ভুটান, পূর্বে আসাম ও বাংলাদেশ, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, দক্ষিণ-পশ্চিমে উড়িষ্যা এবং পশ্চিমে বিহার ও নেপাল। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের **আয়তন** ৩৩,৯২৮ বর্গমাইল বা ৮৮·২ হাজার বর্গ-কি-মি.। ১৯৭১ খ্রীস্টাব্দের লোক গণনানুসারে পশ্চিমবঙ্গের **লোকসংখ্যা** ৪ কোটি ৪৪ লক্ষের কিছু বেশী।*

---

* পুরুষ ২,৩৪,৮৮,২৪৪, স্ত্রীলোক ২,০৯,৫১,৮৫১ জন।

শাসনতান্ত্রিক বিভাগ—শাসনকার্যের সুবিধার জন্য পশ্চিমবঙ্গকে তিনটি বিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে ; বিভাগগুলি ১৬টি জেলা লইয়া গঠিত। যথা—

(ক) **প্রেসিডেন্সী বিভাগ**—(১) কলিকাতা, (২) ২৪ পরগনা, (৩) নদীয়া, (৪) মুর্শিদাবাদ, (৫) হাওড়া।

(খ) **বর্ধমান বিভাগ**—(১) বর্ধমান, (২) বীরভূম, (৩) বাঁকুড়া, (৪) পুরুলিয়া, (৫) হুগলী, (৬) মেদিনীপুর।

(গ) **জলপাইগুড়ি বিভাগ**—(১) জলপাইগুড়ি, (২) দার্জিলিং, (৩) কুচবিহার, (৪) মালদহ, (৫) পশ্চিম দিনাজপুর।

লোকসংখ্যা অনুযায়ী অঞ্চল—জলবায়ু স্বাস্থ্যকর, যাতায়াতের সুবিধা আছে, জীবিকা অর্জন সহজ বলিয়া পশ্চিমবঙ্গে আয়তনের অনুপাতে লোকসংখ্যা অত্যন্ত অধিক। ১৯৭০-৭১ খ্রীস্টাব্দে পূর্ব-পাকিস্তান (অধুনা বাংলাদেশ) হইতে উদ্বাস্তু আগমনের ফলে এই রাজ্যের লোকসংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। এখানে প্রতি বর্গমাইলে ১,৩১০ (বর্গ কিলোমিটারে ৫০৬) জন লোক বাস করে। কেরল ভিন্ন ভারতের অপর কোন রাজ্যে এত ঘন-বসতি নাই। যাহারা চাষ-আবাদ করিয়া জীবিকা অর্জন করে তাহারা গ্রামাঞ্চলে বাস করে। পশ্চিমবঙ্গের শতকরা ৭৫ জন লোক গ্রামে ও ২৫ জন লোক শহরে বাস করে।* শিল্প, বাণিজ্য, চাকরি ও নানাবিধ কাজকর্মের সুবিধার জন্য কলিকাতা ও ইহার নিকটবর্তী শিল্পাঞ্চলে সর্বাপেক্ষা বেশী ঘন লোক-বসতি ; প্রতি বর্গমাইলে প্রায় ৮০ হাজার (প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৩১·২৫ হাজার)।

* পশ্চিমবঙ্গে ৪১,৯৫১টি গ্রাম ও ১৩৭টি শহর আছে।

বৃহত্তর কলিকাতার জনসংখ্যা ৭০ লক্ষ ৪০ হাজারের উপর ; শিক্ষিতের সংখ্যা শতকরা ৩৩ জন।

এই রাজ্যের ঘনবসতি অঞ্চলগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যথা—

অধিক ঘনবসতি অঞ্চল—বৃহত্তর কলিকাতা, ২৪ পরগনা, হুগলী ও হাওড়া। হুগলী নদীর উভয় তীরে অসংখ্য কলকারখানা থাকায় লোকবসতি সর্বাপেক্ষা ঘন।

মধ্যম ঘনবসতি অঞ্চল—বর্ধমান, মেদিনীপুর, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিম দিনাজপুর, নদীয়া, মালদহ, পুরুলিয়া ও কুচবিহার দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে। এই সকল অঞ্চল কৃষিপ্রধান। ইহা ছাড়া, নানারকম শিল্প-কারখানা থাকিবার ফলে লোকবসতি ঘন।

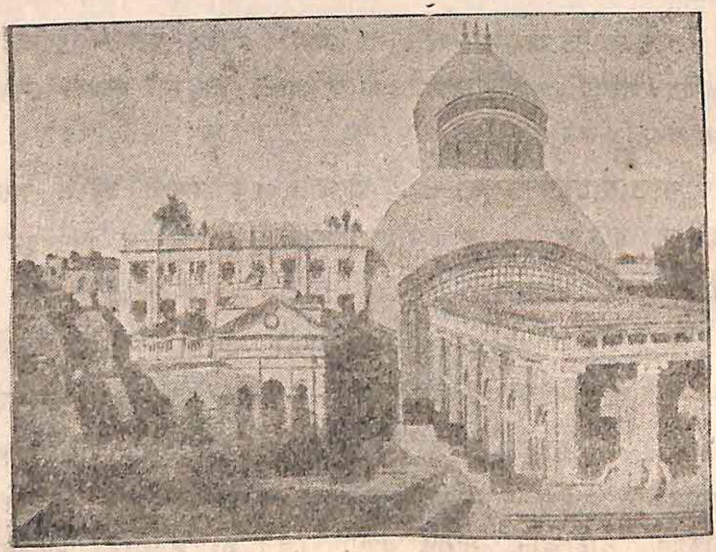
স্বল্প বসতি অঞ্চল—দার্জিলিং জেলার পার্বত অঞ্চলে কৃষিযোগ্য ভূমির অভাব এবং যাতায়াতের সুবিধা তেমন নাই বলিয়া সেখানে লোকবসতি কম।

যাতায়াতের ব্যবস্থা—এই রাজ্যের এক অঞ্চল হইতে অন্যান্য অঞ্চলে রাজপথে, রেলপথে, নৌপথে ও বিমানপথে পরিবহন ও যাতায়াতের সুবিধা আছে।

কয়েকটি প্রসিদ্ধ নগর—কলিকাতা হুগলী নদীর পূর্বতীরে অবস্থিত পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী। ইহা ভারতের **শ্রেষ্ঠ নগর ও দ্বিতীয় বন্দর**। কলিকাতার উপকণ্ঠে **দমদম** আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর। এখানকার দ্রষ্টব্য স্থানসমূহের মধ্যে ফোর্ট উইলিয়ম, রাজভবন, যাদুঘর, হাইকোর্ট, সংসদ ভবন, তেরতলা সরকারী দপ্তরখানা, ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধ, কালীঘাটের কালীমন্দির, পরেশনাথের মন্দির



ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধ

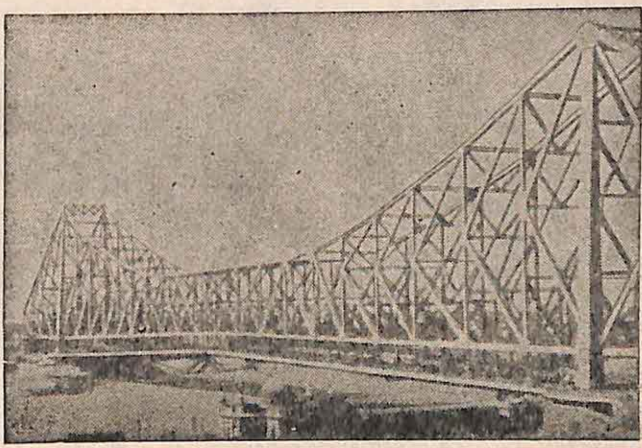


কালীঘাটের মন্দির



বেলুড় মঠ

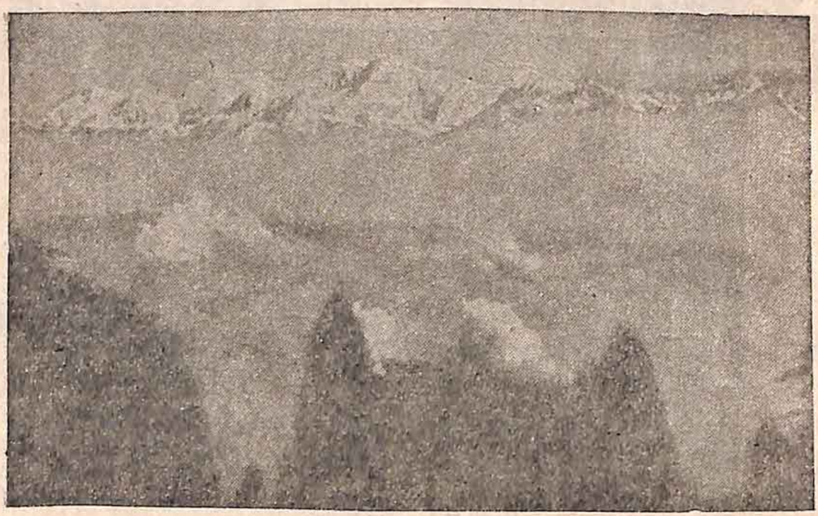
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণি প্রতিষ্ঠিত ভবতারিণীর মন্দির ও রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সাধনপীঠ এবং বেলুড়ে



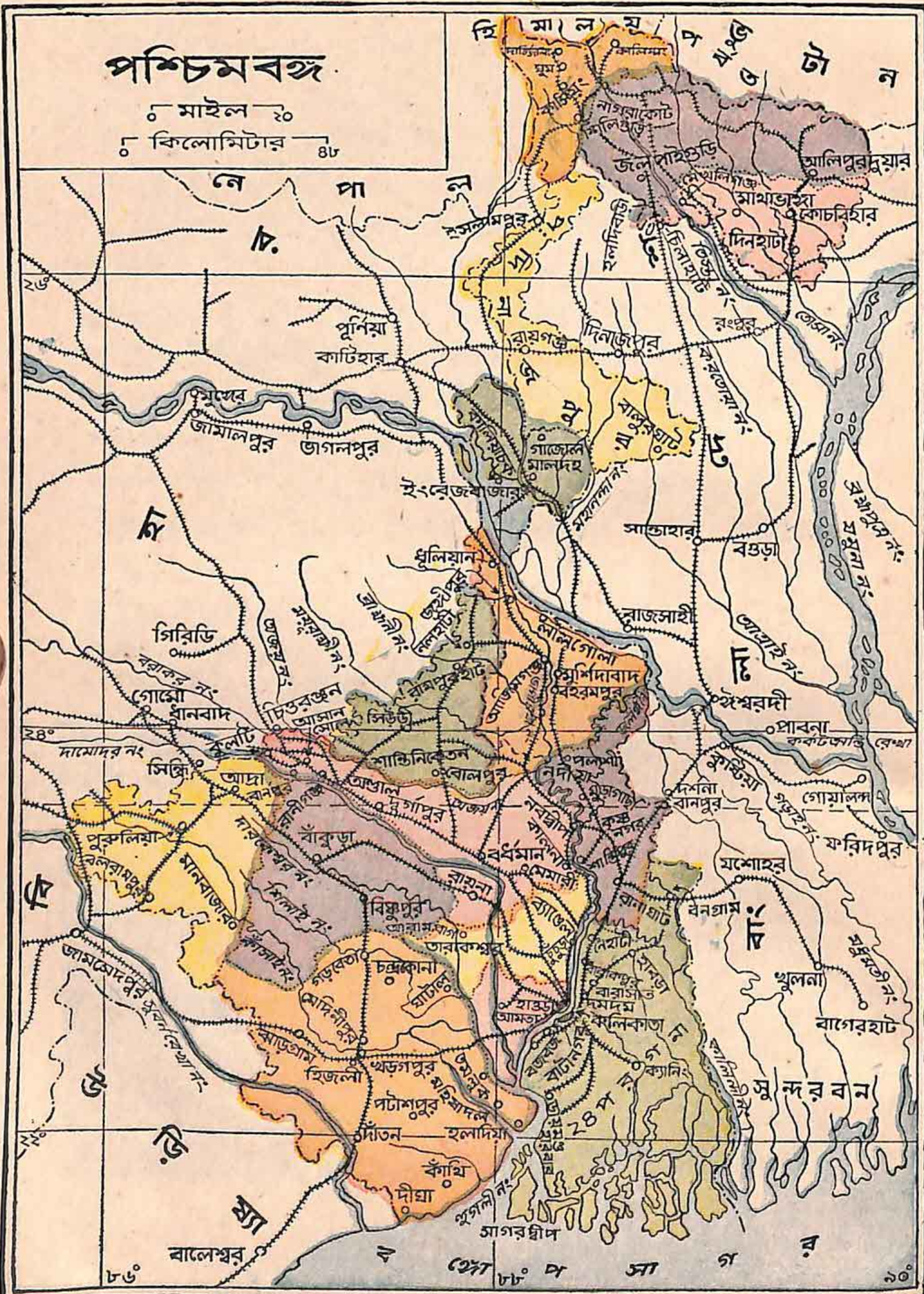
রবীন্দ্র-সেতু

রামকৃষ্ণ মিশনের মঠ অন্যতম দ্রষ্টব্য স্থান। হুগলী নদীর উপর রবীন্দ্র-সেতু একটি দর্শনীয় বস্তু। ভাগীরথী নদীতীরে অবস্থিত **মুর্শিদাবাদ** একটি প্রাচীন শহর। এখানকার **রেশম শিল্প** বিখ্যাত।

দামোদর নদের তীরে অবস্থিত **বর্ধমান** এই জেলার সদর শহর। এখানে বিশ্ববিদ্যালয় ও শিল্প বিদ্যালয় আছে। বীরভুম জেলায় **বোলপুরে** কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিপূত **শান্তিনিকেতন** ও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত **বিশ্বভারতী** অবস্থিত। **দার্জিলিং** হিমালয় ক্রোড়ে একটি মনোরম পার্বত শহর। এখান হইতে কাঞ্চনজঙ্ঘার দৃশ্য অপূর্ব। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল গ্রীষ্মের সময় এই শহরে বাস করেন। দার্জিলিং-এর চা ও কমলালেবু বিখ্যাত। **কালিম্পং** একটি স্বাস্থ্যকর স্থান। এখানে তিব্বতী পশুলোমের বাজার আছে। তিস্তা নদীর তীরে অবস্থিত **জলপাইগুড়ি** এই জেলার সদর শহর। ইহা **চা** ব্যবসায়ের জন্য বিখ্যাত। কাঁসাই (কংসাবতী) নদীর তীরে অবস্থিত **মেদিনীপুর** এই জেলারপ্রধান শহর।



কাঞ্চনজঙ্ঘা


পশ্চিমবঙ্গ
মাইল ২০
কিলোমিটার ৪৮
হিমালয়
নেপাল
ভুটান
দার্জিলিং
ঘুম
কালিম্পং
কার্শিয়াং
নাগরাকোট
শিলিগুড়ি
জলপাইগুড়ি
আলিপুরদুয়ার
মেখলিগঞ্জ
মাথাভাঙ্গা
কোচবিহার
দিনহাটা
ইসলামপুর
রায়গঞ্জ
দিনাজপুর
বালুরঘাট
রংপুর
পূর্ণিয়া
কাটিহার
মুঙ্গের
জামালপুর
ভাগলপুর
গাজোল
মালদহ
ইংরেজবাজার
সান্তাহার
বগুড়া
ধুলিয়ান
জঙ্গীপুর
নলহাটি
রাজসাহী
লালগোলা
মুর্শিদাবাদ
বহরমপুর
রামপুরহাট
সিউড়ী
ঈশ্বরদী
পাবনা
গিরিডি
গোমো
ধানবাদ
চিত্তরঞ্জন
আসানসোল
কুলটি
বরাকর নং
দামোদর নং
সিন্দ্রি
আদ্রা
শান্তিনিকেতন
বোলপুর
পলাশী
নদীয়া
কর্কটক্রান্তি রেখা
কুষ্টিয়া
দর্শনা
বানপুর
গোয়ালন্দ
ফরিদপুর
পুরুলিয়া
বলরামপুর
মানবাজার
রাণীগঞ্জ
অণ্ডাল
দুর্গাপুর
বাঁকুড়া
নবদ্বীপ
কৃষ্ণনগর
বর্ধমান
মেমারী
রাণাঘাট
যশোহর
বনগ্রাম
বিষ্ণুপুর
তারকেশ্বর
ব্যাণ্ডেল
নৈহাটী
জামশেদপুর
গড়বেতা
চন্দ্রকোনা
ঘাটাল
মেদিনীপুর
হাওড়া
আমতা
বারাসাত
দমদম
কলিকাতা
খুলনা
বাগেরহাট
ঝাড়গ্রাম
হিজলী
খড়গপুর
তমলুক
বজবজ
ক্যানিং
সুন্দরবন
পটাশপুর
মহিষাদল
২৪ পরগণা
দাঁতন
হলদিয়া
কাঁথি
দীঘা
হুগলী নং
সাগরদ্বীপ
বালেশ্বর
বঙ্গোপসাগর
২৬°
২৪°
২২°
৮৬°
৮৮°
৯০°

প্রথম অধ্যায়

প্রথম পাঠ

পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী

পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদের অধিকাংশই **বাঙ্গালী**। তাহাদের মাতৃভাষা বাংলা। এই বাঙ্গালীদের মধ্যে নানা ধর্মাবলম্বী লোক আছে। তাহাদের মধ্যে হিন্দুদের সংখ্যা অধিক। তাহার পরেই মুসলমানদের স্থান। খ্রীস্টান, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা অনুপাতে কম।* ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের লোকেরাও ব্যবসায়-বাণিজ্য ও নানারকম কাজকর্ম উপলক্ষে এই রাজ্যে আসিয়া বাস করিতেছে। যেমন, মাড়োয়ারী, গুজরাটী, সিন্ধী, বিহারী, ওড়িয়া, অসমীয়া, তামিল, তেলেগু, কানাড়ী, মলয়ালী, পাঞ্জাবী ইত্যাদি। তাহাদের দেহের গঠন, ভাষা, আহার, পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার-আচরণ বাঙ্গালীদের মত নহে।



বাঙ্গালী

* ১৯৭১ খ্রীস্টাব্দের লোক গণনানুসারে পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু ২,৭৫,২৩,৯৫৮ জন, মুসলমান ৬৯,৮৫,২৮৭ জন, আদিবাসী ২০,৫৪,০৮১ জন, খ্রীস্টান ২,০৪,৫৩০ জন, বৌদ্ধ ১,১২,২৫৩ জন এবং জৈন ২৬,৯৪০ জন বাস করে।

ইহাদের মধ্যে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকও আছে। সকলের সঙ্গে মিলিয়া-মিশিয়া বাস ও কাজকর্ম করিলেও বাঙ্গালীরা সর্বত্রই নিজেদের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া চলিয়াছে।



পাঞ্জাবী

বাঙ্গালী ছাড়া পশ্চিম-বঙ্গে কিছু সংখ্যক অন্য উপজাতির বাসও আছে। উদাহরণ স্বরূপ—বর্ধমান, বীরভূম ও পুরুলিয়া জেলার সাঁওতাল, ওঁরাও, মুণ্ডা, বীরহোড়; দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কুচবিহার জেলার নেপালী, ভুটিয়া, লেপচা; মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রামের লোধা ইত্যাদি উপজাতির উল্লেখ করা যাইতে পারে।

এই সকল উপজাতির নিজ নিজ ভাষা, পোশাক ও সামাজিক রীতিনীতি আছে। লেপচারা স্ত্রী পুরুষ উভয়ে নানাপ্রকার রঙিন পাথরের মালা গলায় পরে। সাঁওতালেরা তীর-ধনুক লইয়া শিকার করে এবং কোন পর্ব উপলক্ষে মাদল বাজাইয়া স্ত্রী পুরুষ উভয়ে নাচ-গান করে। ওঁরাও, মুণ্ডা, সাঁওতাল প্রভৃতি উপজাতির লোকেরা স্ত্রী পুরুষ খনিতে মজুর খাটে। ভুটিয়ারা স্ত্রী পুরুষ উভয়ে দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলায় চা বাগানে কুলির কাজ করে।



সাঁওতাল

ভারতের অন্যান্য রাজ্যের লোক ছাড়াও পৃথিবীর প্রায় সব দেশেরই ভিন্ন ভাষাভাষী, ভিন্ন ধর্মাবলম্বী কিছু লোক নানারকম কাজের জন্য



নেপালী



মুণ্ডা

বিশেষ করিয়া কলিকাতা ও শহরতলিতে বাস করে। এই কারণে বৃহত্তর কলিকাতাকে একটি মানব মিলন-কেন্দ্র বলা যাইতে পারে।

দ্বিতীয় পাঠ

খাদ্য

জীবনধারণের জন্য খাদ্যের একান্ত প্রয়োজন। আমাদের এই খাদ্যের উপাদান প্রাণী, উদ্ভিদ্, লবণ ও জল হইতে পাওয়া যায়। নানা শ্রেণীর খাদ্য দেহের নানা প্রয়োজন সাধন করে। মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, ছানা, ডাল প্রভৃতি প্রোটিন বা আমিষ জাতীয় খাদ্য দেহকে পুষ্ট করে ও সুস্থ রাখে; চাল, গম, আলু, চিনি, মধু প্রভৃতি কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা জাতীয় খাদ্য দেহে তাপ উৎপাদন করে; মাখন, তেল, ঘি,

চর্বি প্রভৃতি স্নেহ জাতীয় খাদ্য দেহকে স্নিগ্ধ রাখে, শীত নিবারণ করে ও দেহে শক্তি জোগায় ; লবণ আহার্যকে সুস্বাদু করে এবং পরিপাকের কাজে সাহায্য করে। ইহা ছাড়া বিভিন্ন ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ-যুক্ত শাক-সবজী ও ফল-মূল নানাভাবে দেহের উপকার করে। পশ্চিমবঙ্গের জলবায়ু, বৃষ্টিপাত ও ভূমির প্রকৃতি দেহরক্ষা ও দেহবৃদ্ধির উপযোগী সর্বপ্রকার প্রাণীজ এবং উদ্ভিজ্জ খাদ্য উৎপাদনের অনুকূল।

বাঙ্গালীর খাদ্যের উপাদানের বেশীর ভাগ সংগৃহীত হয় গ্রামের পরিবেশ হইতে। পশ্চিমবঙ্গে ধানের চাষ বেশী হয়। তাই বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য ভাত। ভাতের সঙ্গে ডাল, নানা রকম শাক-তরকারী, মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, দৈ, পায়স, নানারকম ফল ইত্যাদি ঋতু ও অবস্থাভেদে বাঙ্গালীর খাদ্য। ইহা ছাড়া চিড়া, মুড়ি, খৈ, মুড়কি, ছাতু ইত্যাদি সাধারণ বাঙ্গালীর জলখাবার। আজকাল বাঙ্গালীরাও অবাঙ্গালীদের ন্যায় গমের রুটি খাইতে অভ্যস্ত হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গের খালে, বিলে, নদীতে, দীঘি ও পুকুরে নানারকম মাছ পাওয়া যায়। রুই, কাতলা, মৃগেল, ইলিশ, চিংড়ি, ভেটকী, বোয়াল, চিতল, পাবদা, বাটা, ট্যাংরা, কৈ, শিঙ্গি, মাগুর ইত্যাদি মাছ বাঙ্গালীর প্রিয় খাদ্য। ম্যাকরেল, ভোলা, পমফ্রেট প্রভৃতি সামুদ্রিক মৎস্য অপেক্ষা স্বাদু জলের টাটকা মাছ বাঙ্গালীর অধিক প্রিয়। মাংস ও ডিম বাঙ্গালীর অন্যতম প্রিয় খাদ্য। ছাগল হইতে মাংস এবং হাঁস ও মুরগী হইতে ডিম ও মাংস দুই-ই পাওয়া যায়।

গ্রামাঞ্চলে চাষীরা আলু, বেগুন, লাউ, কুমড়ো, বীট, গাজর, পটল, ঝিঙে, কপি, সিম, ঢেঁড়স ও নানারকম শাক-সবজীর চাষ করে। ইহা ছাড়া আম, কাঁঠাল, কলা, পেঁপে, লিচু, আতা, পেয়ারা,

শশা, আখ ইত্যাদি নানারকম ফলও বিভিন্ন ঋতুতে উৎপন্ন হয়। এ-সমস্তই বাঙ্গালীর প্রিয় খাদ্য।

দুগ্ধ একটি পুষ্টিকর খাদ্য। গোরু, মহিষ ও ছাগল দুধ দেয়। গো-মহিষাদির দুগ্ধ হইতে ঘি, মাখন, ছানা, পায়স, দৈ, ঘোল প্রভৃতি পুষ্টিকর এবং সুস্বাদু খাদ্য প্রস্তুত হয়। ছাগলের দুধ সাধারণত শিশু ও রোগীর পথ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। দুধ হইতে সন্দেশ, রসগোল্লা, পান্তুয়া, চম্‌চম্‌, রাবড়ি ইত্যাদি নানাবিধ মিষ্টদ্রব্য প্রস্তুত হয়। উৎসব-অনুষ্ঠানে এবং সামাজিকতায় এই সমস্ত মিষ্টদ্রব্য দ্বারা অতিথি-অভ্যাগতদের আপ্যায়ন করা হয়।

বাঙ্গালীদের মধ্যে যাহাদের আর্থিক অবস্থা ভাল তাহারা ভাতের সঙ্গে মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, দৈ, ফল ও মিষ্টদ্রব্য ইত্যাদি নানারকম পুষ্টিকর সুষম খাদ্য আহার করে। কিন্তু যাহারা গরীব তাহারা সাধারণত মোটা চাউলের ভাত, ডাল ও সাধারণ তরকারী আহার করে। ইহা ছাড়া, তাহারা খৈ, মুড়ি, ছাতু প্রভৃতি সহজলভ্য খাদ্য খাইয়া থাকে। পাহাড় অঞ্চলের গরীব লোকেরা নানাজাতীয় ফলমূল, রুটি ও ভুট্টা বেশী পরিমাণে খাইতে অভ্যস্ত।

তৃতীয় পাঠ

পোশাক

আদিম যুগে মানুষ ছিল প্রকৃতির অনুগত। ফল-মূল খাইয়া সে জীবন ধারণ করিত এবং গাছের বাকল পরিয়া লজ্জা নিবারণ করিত। ক্রমে সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সৌন্দর্য ও আভিজাত্যের নিদর্শন রূপে পোশাকের সমাদর দেখা যায়।

প্রাকৃতিক পরিবেশ, রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও আর্থনীতিক প্রভাবে পোশাকের পার্থক্য ও প্রচলন লক্ষ্য করা যায়।

দার্জিলিং জেলার পার্বত অঞ্চলে সব ঋতুতেই শীতের প্রকোপ বেশী, তাই সেখানকার লোকেরা আঁট-সাঁট পায়জামা, কুর্তা, পশমের জামা, কাপড়, টুপী, দস্তানা, মোজা, জুতা ইত্যাদি ব্যবহার করে। মেয়েরা ঘাগরা, কামিজ, ওড়না ইত্যাদি পরে। কিন্তু সমতল ভূমিতে অপেক্ষাকৃত কম শীত, বিশেষতঃ গ্রীষ্মের সময় গরমের মাত্রা বেশী। তাই এই অঞ্চলের লোকেরা সুতীর পোশাকই বেশী ব্যবহার করে। লেপচা, ভুটিয়া, নেপালী প্রভৃতি পার্বত অঞ্চলের অধিবাসীদের পোশাক এবং সমতলবাসী সাঁওতাল, ওঁরাও, লোধা প্রভৃতি উপজাতীয় লোকজনের পোশাক প্রাকৃতিক পরিবেশের জন্য বিভিন্ন।



ভুটিয়া

বর্তমান কালের বাঙ্গালী হিন্দুদের পোশাকে নানারূপ বৈচিত্র্য

দেখা গেলেও তাহাদের জাতীয় পোশাক ধুতি ও পাঞ্জাবী বা সার্ট এবং রেশম বা সুতীর চাদর। অনেকে গ্রীষ্মকালে পাতলা সুতীর জামা (ফতুয়া বা গেঞ্জি) গায়ে দেয়। কখনো কখনো কোমর হইতে গায়ের উপরের দিক পর্যন্ত অনাবৃতই থাকে। বাঙ্গালী মুসলমানেরা পায়জামা বা লুঙ্গি, সার্ট, পাঞ্জাবী বা আচকান পরে এবং অনেকে মাথায় টুপী বা ফেজ পরে।



বাঙ্গালী স্ত্রীলোক

শীতকালে অনেকে পশমের সোয়েটার, পুলওভার, কোট, প্যান্ট, আলোয়ান, শাল ইত্যাদি ব্যবহার করে।



মুসলমান

স্ত্রীলোকেরা তাঁতের ও মিলের সুতী শাড়ী, ব্লাউজ, সায়া, সেমিজ ইত্যাদি পরিধান করে। বাঙ্গালী স্ত্রীলোকদের শাড়ী পরিবার একটি বিশিষ্ট ভঙ্গি আছে। সাধারণ মুসলমান স্ত্রীলোকেরা সচরাচর বোরখা পরিধান করে। শিক্ষিতা মুসলমান স্ত্রীলোকদের মধ্যে এই বোরখা পরিধানের প্রচলন ক্রমশ হ্রাস পাইতেছে। অনেকে শালোয়ার-কামিজ পরে। খ্রীস্টান স্ত্রীলোকদের অনেকে গাউন পরে। অল্পবয়স্ক মেয়েরা ইজের-ফ্রক এবং ছেলেরা হাফ-প্যান্ট ও হাফ-সার্ট

পরে। শ্রমিকদের মধ্যে হাফ-প্যাণ্ট, হাফ-সার্টের ব্যবহার খুব দেখা যায়।

আজকাল বাঙ্গালী হিন্দু, মুসলমান, খ্রীস্টান ও অন্যান্য যুবকদের মধ্যে পায়জামা, প্যাণ্ট, সার্ট, পাঞ্জাবী ইত্যাদির প্রচলন বেশী দেখা যায়। পায়জামা-পাঞ্জাবীতে মুসলমান সংস্কৃতির এবং প্যাণ্ট-সার্টে ইউরোপীয় সংস্কৃতির প্রভাব আছে। সুদূর গ্রামাঞ্চলের লোকেদের মধ্যেও প্যাণ্ট সার্টের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। শহরের স্ত্রীলোকেরাও নানারূপ বিলাতি এবং অবাঙ্গালী পোশাক পরিয়া থাকে। শহরাঞ্চলে স্ত্রী পুরুষ সকলেই পায়ে জুতা ব্যবহার করে।

গ্রামের গরীব লোকেরা, বিশেষতঃ গরীব কৃষকেরা তাঁতের বা মিলের মোটা ধুতি, সাধারণ জামা, গামছা ইত্যাদি ব্যবহার করে। তাহারা শীতকালে মোটা খদ্দরের বা সুতীর চাদর ব্যবহার করে। স্ত্রীলোকেরা তাঁতের বা মিলের সাধারণ শাড়ী পরিয়া থাকে। সাধারণত গ্রামাঞ্চলে স্ত্রী পুরুষ উভয়েই খালি পায়ে চলাফেরা করে।

বর্তমানে কাজকর্মের সুবিধার জন্য শহরাঞ্চলের বাঙ্গালীদের রকমারি পোশাক দেখিয়া বাঙ্গালীর জাতীয় পোশাকের সঠিক পরিচয় পাওয়া না গেলেও গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের পোশাক-পরিচ্ছদে এখনও তাহার সম্যক পরিচয় মেলে।

চতুর্থ পাঠ

বাড়িঘর

জীবনধারণের জন্য মানুষের অন্ন-বস্ত্রের যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন একটি বাসগৃহের। আদিম যুগ হইতেই মানুষ হিংস্র জন্তুর এবং শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা ও নানারূপ প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং দুর্বৃত্তের কবল হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য একটি নিরাপদ আশ্রয়ের প্রয়োজন অনুভব করিয়া আসিতেছে। বর্তমানের উন্নত ধরনের বাসগৃহ তাহারই সহজ ও স্বাভাবিক পরিণতি।

সমতল ভূমিতে চাষ আবাদ করিবার সুবিধা আছে, যাতায়াত করা সহজ এবং শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসার অধিক। সেই কারণে সমতল ভূমিতেই বেশীর ভাগ লোক বাস করে।

পর্বতের উপর বাসোপযোগী সমতল ভূমির অভাব। জমি কঙ্করময় ও অনুর্বর হওয়ায় কৃষির উপযুক্ত নহে। পার্বত অঞ্চলে রেলপথ ও রাজপথ নির্মাণ করা দুঃসাধ্য। সেখানে শিল্প ও বাণিজ্যের তেমন



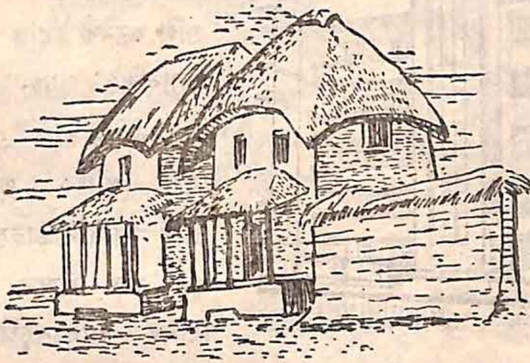
দার্জিলিং উপত্যকার বাড়ি

প্রসার হয় না। এই সকল কারণে পর্বতের উপরে খুবই কম মানুষ বাস করে। উপত্যকা ভূমিতে ছোট ছোট বাড়িঘর নির্মাণ করিয়া কিছু লোক বাস করে।

মানুষেরা মৃত্তিকা ও জলবায়ুর প্রকৃতি অনুসারে তাহাদের বাসগৃহ নির্মাণ করিয়া থাকে। ইহা ছাড়া, বাঁশ, কাঠ, খড়, মাটি, পাথর প্রভৃতি গৃহনির্মাণের বিবিধ উপাদান যেখানে যাহা সহজ লভ্য সেখানে তাহা দিয়া তাহারা সচরাচর বাড়িঘর তৈয়ারি করিয়া বসবাস করে। পশ্চিমবঙ্গের পার্বত অঞ্চলের বাড়িগুলির বেশীর ভাগ ইট, কাঠ ও পাথর দ্বারা নির্মিত হয়। কারণ, পার্বত অরণ্যের কাষ্ঠ সহজ লভ্য। সেখানে মাটির অভাবে পাথরের ব্যবহার দেখা যায়। দার্জিলিং জেলার পার্বত অঞ্চলের কাঠের তৈয়ারি বাড়িগুলি অনেকটা বাংলো ধরনের। দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলার তরাই অঞ্চলের অধিবাসীদের বাসগৃহ-গুলিও সেখানকার বনভূমির শাল, সেগুন প্রভৃতি কাঠ দ্বারা নির্মিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণাংশে সুন্দরবনের অধিবাসীদের গৃহগুলিও স্থানীয় সুন্দরী, গরাণ, জারুল, গেঁউয়া প্রভৃতি শক্ত কাঠের দ্বারা তৈয়ারি হয়; উপরে হোগলা বা গোলপাতার ছাউনি দেওয়া হয়। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কুচবিহার প্রভৃতি জেলায় অধিক বৃষ্টিপাতের জন্য বাড়িঘরের ছাদ ঢালু।

পশ্চিমবঙ্গের গৃহ নির্মাণ পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য আছে। শহরের খাপরা বা টালির বস্তি-বাড়িগুলি ছাড়া প্রায় সকল বাড়িই পাকা। কিন্তু গ্রামাঞ্চলের বাড়িগুলি ভিন্ন ধরনের। গ্রামের বাড়িগুলির দেয়াল সাধারণত মাটি কিংবা টিন অথবা বাঁশের চাঁচারির বেড়া দ্বারা নির্মিত হয় এবং উহাদের চালা ঢালু এবং টিন, টালি, এসবেস্টস্, খাপরা, গোল-পাতা, হোগলা কিংবা খড় দ্বারা তৈয়ারি হয়। কোন কোন বাড়ি দোচালা, চৌচালা কিংবা আটচালাও দেখা যায়। বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম প্রভৃতি জেলায় এই ধরনের চালাঘর আছে। এইসব অঞ্চলে এবং হাওড়া, হুগলী ও মেদিনীপুর জেলায় খড়ের ছাউনির বাড়িই বেশী।

কোন কোন অঞ্চলে মাটির দোতলা বাড়িও রহিয়াছে। গরমের দিনে এইসকল বাড়ি কিছুটা ঠাণ্ডা থাকে। গ্রামে পাকা বাড়ি খুব কমই দেখা যায়। সাধারণত ধনী ব্যক্তিদের বাসগৃহ কিংবা দেব-দেবীর



বীরভূম জেলার গ্রামের বাড়ি

মন্দিরগুলিই পাকাবাড়ি হয়। গ্রামাঞ্চলে সাধারণ অবস্থার কৃষকদের বাড়িও খোলামেলা হয় এবং কোন কোন বাসগৃহের সংলগ্ন পুকুর বা



সাঁওতাল বস্তি

ফলের বাগান ও চাষের ক্ষেতও দেখা যায়। বাড়ির আশেপাশে গোয়ালঘর, ধানের গোলা, ঢেঁকিঘর, রান্নাঘর এবং বাড়ির মাঝখানে

উঠান দেখিতে পাওয়া যায়। আলো-হাওয়ার জন্য পূর্ব-দক্ষিণ খোলা রাখিয়া বাসগৃহ নির্মাণ করা হয়। কিন্তু স্থানাভাব বশত শহরাঞ্চলে প্রায়ই এই নিয়ম রক্ষা করা যায় না। শহরাঞ্চলের বাড়িগুলি অনেক ঘিঞ্জি। কয়েকতলবিশিষ্ট পাকা বাড়িগুলি শহরের বড় রাস্তা এবং ছোট ছোট গলির তুই ধারে সারি সারি দাঁড়াইয়া থাকে। বড় বড় শহরে বহুতলবিশিষ্ট আকাশচুম্বী ফ্ল্যাটবাড়িও দেখা যায়। তাহার বিভিন্ন অংশে ভাড়াটিয়ারা থাকে। এইরূপ বহুতলবিশিষ্ট বাড়িতে লিফ্‌টের সাহায্যে ওঠানামা করিতে হয়।



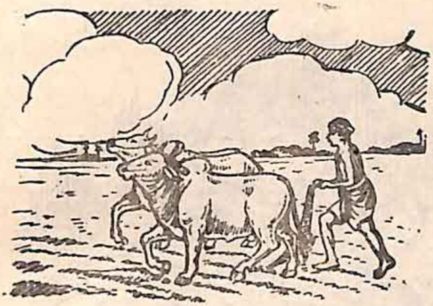
শহরাঞ্চলে বহুতলবিশিষ্ট বাড়ি

পঞ্চম পাঠ

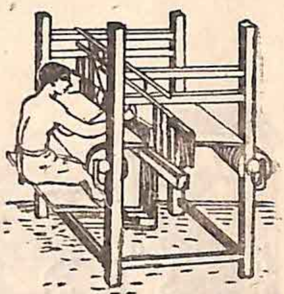
জীবিকা

ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু, মৃত্তিকা, খনিজ সম্পদ, বনজ সম্পদ, জীবজন্তু প্রভৃতি একত্রে একটি ভৌগোলিক পরিবেশ রচনা করে। মানুষের খাদ্য, পোশাক ও বাসস্থানের ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি অধিবাসীদের উপজীবিকা অর্থাৎ কাজকর্মের উপরও পরিবেশের যথেষ্ট প্রভাব দেখা যায়। কৃষিকার্য, শিল্পদ্রব্য উৎপাদন, খনিজ পদার্থ উত্তোলন এবং তাহা দ্বারা নানাবিধ ভোগ্যপণ্য প্রস্তুত করা, কাষ্ঠ আহরণ, পশুপালন,

পশুশিকার, মৎস্যশিকার প্রভৃতি বৃত্তি মানুষের নিজ নিজ প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর অনেকটা নির্ভর করে।



চাষী



তাঁতী

পশ্চিমবঙ্গ কৃষিপ্রধান রাজ্য। এইরাজ্যে মৌসুমী জলবায়ু, কর্ষণযোগ্য পলিমাটি, প্রচুর বৃষ্টিপাত প্রভৃতির সমাবেশে চাষ-আবাদের সুবিধা সর্বাপেক্ষা বেশী বলিয়া জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশী লোক **কৃষিকার্যের** সাহায্যে জীবিকা নির্বাহ করে। যাহারা কৃষিকার্যের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে তাহাদিগকে **চাষী** বলা হয়। তাহারা গরু ও লাঙ্গলের সাহায্যে মাঠে চাষ করে। আজকাল সরকার গ্রামাঞ্চলে চাষ-আবাদের উন্নতির জন্য বিদ্যুৎচালিত পাম্প ও উত্তম বীজ, সার প্রভৃতি সরবরাহ করিতেছেন।

চাষের কাজ ভিন্ন এই রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে নানারকম কুটীরশিল্পের কাজে অনেক লোক নিযুক্ত আছে। এইসকল শিল্পের কাজ তাহাদের জাতিগত পেশা। এই পেশাগুলি তাহাদের জীবিকা অর্জনের প্রধান উপায়। তূলা হইতে যে সুতা তৈয়ারি হয় সেই সুতার সাহায্যে **তন্তুবায়** বা **তাঁতীরা** কাপড়, গামছা, চাদর, মশারি প্রভৃতি নিত্যব্যবহার্য দ্রব্য তৈয়ারি করিয়া গ্রামের হাটে-বাজারে, এমন কি শহরের বাজারেও,

উহা বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। তাঁতীরা আজকাল বৈদ্যুতিক শক্তিচালিত তাঁতের সাহায্যেও এই সব দ্রব্যাদি তৈয়ারি করিতে শিখিয়াছে।



কর্মকার



কুম্ভকার

কর্মকার বা **কামারেরা** আগুনে লোহা উত্তপ্ত করিয়া হাতুড়ি দ্বারা পিটাইয়া বঁটি, সাঁড়াশি, ছুরি, কাঁচি, কাটারি, কাস্তে, খুন্তি, যাঁতি, চাটু, কুড়াল, কোদাল, শাবল, লাঙ্গলের ফলা ইত্যাদি নানারকম প্রয়োজনীয় লোহার দ্রব্যাদি তৈয়ারি করিয়া এবং বাজারে বিক্রয় করিয়া অর্থ উপার্জন করে। **স্বর্ণকারেরা** সোনারূপার অলঙ্কার নির্মাণ করে। **কংসবণিক** বা **কাঁসারীরা** পিতল কাঁসার দ্রব্য প্রস্তুত করে। **কুম্ভকার** বা **কুমারেরা** মাটির তাল চাকায় ঘুরাইয়া হাঁড়ি, কলসী, কুঁজো, গেলাস, ঘট, পুতুল, প্রতিমা ইত্যাদি নির্মাণ করে এবং গঞ্জে, বাজারে ও মেলায় বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে।

সূত্রধর বা **ছুতারেরা** করাত, হাতুড়ি, বাটালি, তুরপুন প্রভৃতি যন্ত্রের সাহায্যে বাসগৃহের জানালা, দরজা এবং আসবাবপত্র, যেমন—

চেয়ার, টেবিল, টুল, আলনা, আলমারি, খাট, চৌকি ইত্যাদি তৈয়ারি করে এবং এই সকল জিনিস বিক্রয় করিয়া অর্থ উপার্জন করে।

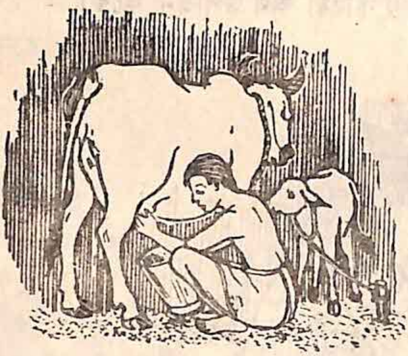


সূত্রধর

কেহ কেহ জাতিগত বা কৌলিক বৃত্তির উপর নির্ভর করিয়া সংসারযাত্রা নির্বাহ করে। যেমন, **পুরোহিত** যজমানী করিয়া, **ধোপা** কাপড় কাচিয়া, **নাপিত** ক্ষৌরকর্ম করিয়া, **কলু** বা **তেলিরা** তৈল বিক্রয় করিয়া এবং **জেলেরা** ছোট-বড় নানারকম জালের সাহায্যে নদী, খাল, বিল ও পুকুরে মাছ ধরিয়া জীবিকা নির্বাহ করে।

গোয়ালারা গোরু-মহিষাদি পালন করে এবং শহর ও গ্রামের লোকেদের দুধের যোগান দেয়। তাহারা গোরু ও মহিষের দুধ হইতে তৈয়ারি দৈ, ঘি, ছানা, ঘোল ইত্যাদি বিক্রয় করিয়া সংসার চালায়।

কিছু লোক জীব-জন্তু ও পশুর মাংস বিক্রয় করিয়া অর্থ উপার্জন করে। ইহাদিগকে **কসাই** বলে। তাহারা সাধারণত গোরু, শূকর ও ছাগলের মাংস এবং চামড়া বিক্রয় করে। কেহ কেহ হাঁস, মুরগী পালন করে এবং উহাদের মাংস ও ডিম বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে।



গোয়ালা

কলিকাতা শিল্পাঞ্চলে এবং রাণীগঞ্জ, আসানসোল, চিত্তরঞ্জন, দুর্গাপুর প্রভৃতি খনি ও শিল্পাঞ্চলে **শ্রমিকেরা** খাদ ও কলকারখানায় কাজ করিয়া জীবিকা অর্জন করে। দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলার চা বাগানগুলিতে বহুসংখ্যক স্ত্রী-পুরুষ নিযুক্ত আছে। তরাই ও সুন্দরবন হইতে বিভিন্ন শিল্পের প্রয়োজনীয় এবং গৃহনির্মাণ ও জ্বালানির জন্য কাষ্ঠ আহরণ করিয়া এবং তৃণভূমিতে পশুপালন করিয়া অনেক লোক জীবন-যাপন করে। সমুদ্র উপকূলের অধিবাসী এবং নদীবহুল অঞ্চলের লোকেরা **মাঝি-মাল্লার** কাজ করে। সুন্দর-বন অঞ্চলে অনেকে **মধু-সংগ্রহ** করিয়া বিক্রয় করে।



মোড়া ও ঝাঁকা

কেহ কেহ ঝাঁকা, মোড়া, ঝুড়ি, কুলা, ধামা, দর্মা, মাদুর, জাল ইত্যাদি তৈয়ারি করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে।

শহরের অধিকাংশ লোকই শিক্ষিত ও চাকুরীজীবী। কেহ কেহ

অফিসের **কেরানী, কর্মচারী,** আদালতের **উকিল** বা **বিচারক,** প্রশাসন বিভাগের **পুলিশ,** কেহ কেহ স্কুল-কলেজের **শিক্ষক,** কেহ বা **ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার।** অনেকে নানা প্রকার **ব্যবসায়-বানিজ্য** দ্বারা অর্থ উপার্জন করে। কেহ বা **শিল্পী, অভিনেতা, সাহিত্যিক** কিংবা **গায়ক।** আবার, একদল লোক **সাংবাদিকতার** বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। অন্যদিকে, শহরের আর একদল লোক ট্রাম, বাস, ট্যাক্সি, লরি, টেম্পো, ঠেলা ও রিক্সা চালাইয়া জীবিকা অর্জন করে। কেহ বা **মুটের** কাজ করে। যাহারা জুতা মেরামত বা চামড়ার কাজে নিযুক্ত তাহাদের **মুচি** বলে। শহরাঞ্চলে প্রতিদিন যে জঞ্জাল, ময়লা ও আবর্জনা পুঞ্জীভূত হয় তাহা পরিষ্কারের কাজে এক-শ্রেণীর লোক নিযুক্ত থাকে—তাহাদের বলা হয় **মেথর** বা **জমাদার।** শ্মশানে বা হাসপাতালের শবাগারে মৃতদেহ সংকারের কাজে সাহায্য করাই একজাতীয় লোকের জীবিকা ; তাহাদের বলা হয় **ডোম।**

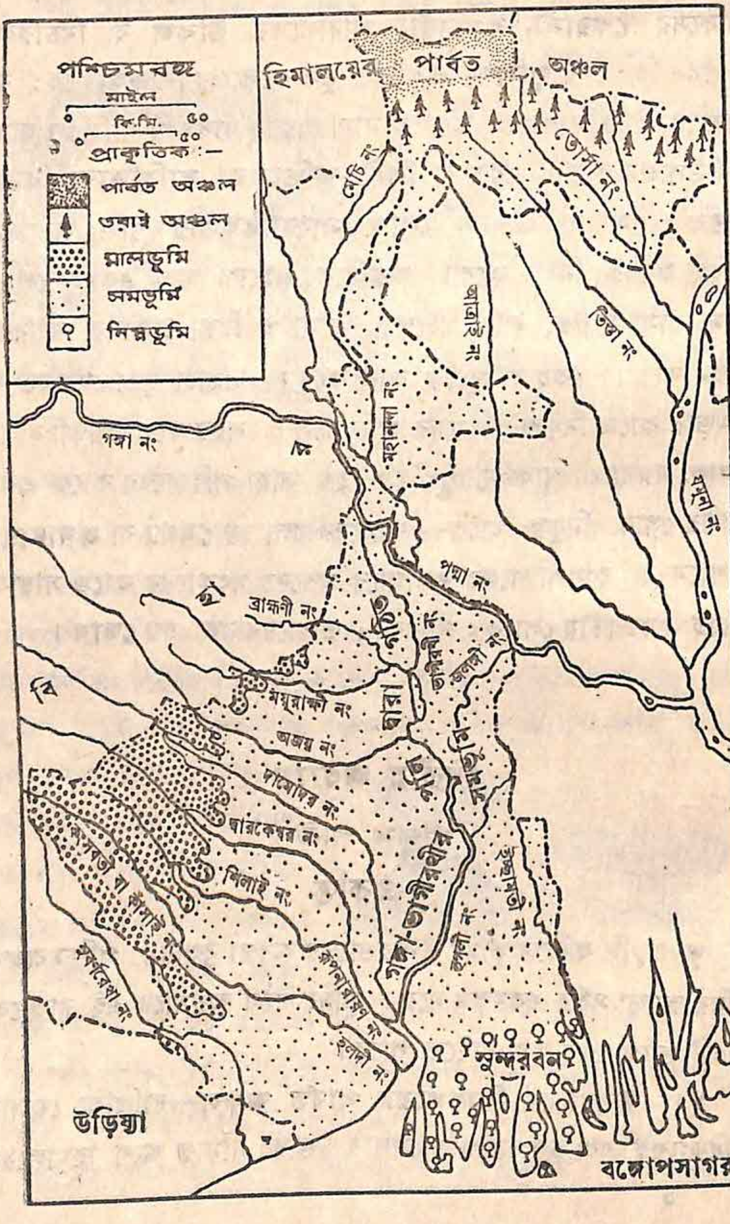
দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম পাঠ

ভূ-প্রকৃতি

ভূ-প্রকৃতি বলিতে ভূমির উপরিভাগের অবস্থা বুঝায়। পশ্চিমবঙ্গের ভূমির অবস্থা সর্বত্র একরকম নহে। ভূমির গঠন অনুসারে এই রাজ্যকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে।

১। **উত্তরাংশে হিমালয়ের পার্বত অঞ্চল**—দার্জিলিং জেলার অধিকাংশই এবং জলপাইগুড়ি জেলার উত্তরের সামান্য অংশ হিমালয়ের


পশ্চিমবঙ্গ
মাইল
কি.মি.
প্রাকৃতিক :—
পার্বত অঞ্চল
তরাই অঞ্চল
মালভূমি
সমভূমি
নিম্নভূমি
হিমালয়ের পার্বত অঞ্চল
মেচি নং
তোর্সা নং
আত্রাই নং
তিস্তা নং
মহানন্দা নং
গঙ্গা নং
যমুনা নং
পদ্মা নং
ব্রাহ্মণী নং
ময়ূরাক্ষী নং
অজয় নং
দামোদর নং
দ্বারকেশ্বর নং
শিলাই নং
জলঙ্গী নং
গঙ্গা-ভাগীরথী
হুগলী নং
ইছামতী নং
রূপনারায়ণ নং
হলদী নং
সুবর্ণরেখা নং
সুন্দরবন
উড়িষ্যা
বঙ্গোপসাগর

পার্বত অঞ্চলের অন্তর্গত। দার্জিলিং শহরটি সাত হাজার ফুটেরও অধিক (২,২৩৩ মি.) উচ্চে অবস্থিত। শিলিগুড়ি রেলওয়ে স্টেশন হইতে একটি ছোট পার্বত রেলপথ আঁকিয়া বাঁকিয়া দার্জিলিং শহর পর্যন্ত গিয়াছে। ইহার নাম 'দার্জিলিং-হিমালয় রেলপথ'। এই রেলপথের উভয়দিকে চা-বাগান, ধানের ক্ষেত, সরলবর্গীয় বৃক্ষ ও ঝরনা দেখা যায়। এই অঞ্চলের তিস্তা, তোর্সা, জলঢাকা প্রভৃতি নদী পর্বতের গভীর খাতের মধ্য দিয়া বেগে প্রবাহিত হইতেছে।

দার্জিলিং পশ্চিমবঙ্গের একটি সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর শহর। ইংরাজীতে ইহাকে 'Queen of Hills' বা 'পাহাড়ের রাণী' বলা হয়। দার্জিলিং ছাড়া এই অঞ্চলে কার্সিয়াং, কালিম্পং প্রভৃতি কয়েকটি স্বাস্থ্যকর পার্বত শহর আছে। দার্জিলিং ও কার্সিয়াং-এর প্রায় মধ্যস্থলে অবস্থিত টাইগার হিল (২,৬১৫ মি.) হইতে হিমালয়ের শৃঙ্গ **কাঞ্চনজঙ্ঘার** (৮,৫৯৮ মি.) বরফাবৃত দেহের উপর সূর্যোদয়ের অপরূপ দৃশ্য বিদেশী ভ্রমণকারীদের আকর্ষণের বস্তু। দার্জিলিং-এর 'অবজারভেটারি হিল', 'ভিক্টোরিয়া ফল্‌স্‌', বৌদ্ধমঠ, "হিমালয় ইনস্টিটিউট্‌' প্রভৃতি দেখিবার জিনিস। দার্জিলিং জেলার উত্তর-পশ্চিম অংশে 'সান্দাক ফু' (প্রায় ৩,৭০০ মি.) এই অঞ্চলের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ। জলপাইগুড়ি ও ভুটানের সীমায় আছে সিঞ্চুলা পাহাড় (১,৮০০ মি.)।

এই অঞ্চলে সমতল ভূমি নাই বলিলেই চলে, সমস্তটাই বন্ধুর ও প্রস্তরময়। পর্বতশ্রেণীর মাঝে মাঝে গভীর উপত্যকা দেখা যায়। এই পার্বত অঞ্চলে বেলেপাথর, শ্লেট, ফিলাইট প্রভৃতি বিভিন্ন রকমের স্তরীভূত ও রূপান্তরিত শিলা এবং কয়লা দেখা যায়। এখানকার ভূমি উত্তর হইতে দক্ষিণদিকে ক্রমশ ঢালু হইয়াছে। এখানে বৃষ্টিপাত

খুব বেশী হয় বলিয়া চারিদিক ঘন অরণ্যবেষ্টিত। এই অরণ্যে ওক, দেবদারু, পাইন, ফার প্রভৃতি বৃক্ষ জন্মে। অধিক বৃষ্টিপাতের ফলে বর্ষাকালে অনেক সময় নরম শিলার স্তর ধসিয়া পড়ে এবং রাস্তাঘাট ও রেলপথ বন্ধ হইয়া যায়।

২। **পর্বতের পাদদেশের তরাই অঞ্চল**—হিমালয়ের পাদদেশ হইতে ২৪ মাইল (৩৮ কি-মি.) দক্ষিণে বিস্তৃত অঞ্চলকে বলা হয় **তরাই** অঞ্চল। দার্জিলিং জেলার দক্ষিণাংশ এবং জলপাইগুড়ি জেলার উত্তরাংশ ইহার অন্তর্গত। ইহার উত্তরাংশের ভূমিভাগ উচ্চ এবং দক্ষিণাংশের ভূমিভাগ ধীরে ধীরে ঢালু হইয়াছে। বেশী বৃষ্টিপাতের জন্য এই অঞ্চলটি আর্দ্র এবং অস্বাস্থ্যকর। তিস্তা, তোর্সা প্রভৃতি নদীর স্রোতে এবং বৃষ্টিপাতের ফলে পাথর, বালি, কাঁকর, নুড়ি প্রভৃতি নরম শিলা হিমালয় হইতে নিচে নামিয়া আসিয়া এই অঞ্চলে সঞ্চিত হয়। তরাইয়ের বনে বাঁশ, বেত, শাল, শিরীষ, শিমুল প্রভৃতি বৃক্ষ জন্মে। জলপাইগুড়ি জেলার উত্তরাংশে তরাই অঞ্চলে **ডুয়ার্সের** বন বিখ্যাত।

৩। **পশ্চিমাংশের মালভূমি অঞ্চল**—এই রাজ্যের পশ্চিমাংশের ভূমি অসমতল ও উচ্চ। পশ্চিমে পুরুলিয়া জেলা এবং বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্ধমান ও মেদিনীপুর জেলার পশ্চিমাংশ ছোটনাগপুর মালভূমির অন্তর্গত। এই অঞ্চলের স্থানে স্থানে কঠিন শিলা দ্বারা গঠিত ছোট ছোট পাহাড় দেখা যায়। এই অঞ্চলটি পশ্চিম হইতে পূর্বে ঢালু। তাই এই অঞ্চলের অজয়, দামোদর, কাঁসাই প্রভৃতি নদনদীর গতি পূর্বমুখী। এই স্থানের পুরুলিয়ায় **অযোধ্যা, বাঘমুণ্ডি** এবং বাঁকুড়ায় **বিহারীনাথ** ও **শুশুনিয়া** উল্লেখযোগ্য পাহাড়। এই অঞ্চলটির উত্তর-পশ্চিমে কয়লার খনি আছে। ইহা ব্যতীত, এই অঞ্চলে অভ্র, তাম্র, চুনাপাথর, স্বর্ণরেণু এবং রাস্তাঘাট নির্মাণের উপযোগী ল্যাটেরাইট পাথর পাওয়া

যায়। এখানে বৃষ্টিপাত কম এবং জমি উর্বর নয়। অর্জুন, শাল, মহুয়া, কুল, পলাশ, বাব্‌লা প্রভৃতি গাছ এখানে বেশী দেখা যায়। এখানকার মাটি লাল, বালুকা ও কঙ্করময়।

৪। **উত্তর ও দক্ষিণের সমভূমি অঞ্চল**—উত্তরের পার্বত অঞ্চল ও পশ্চিমের মালভূমি অঞ্চল ব্যতীত পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ ভূমিই নদীবাহিত পলির দ্বারা গঠিত সমভূমি। গঙ্গানদী (পদ্মা) পশ্চিমবঙ্গের বিরাট সমভূমিকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। কুচবিহার, জলপাইগুড়ি, পশ্চিম দিনাজপুর প্রভৃতি জেলার অধিকাংশ উত্তরের সমভূমির অন্তর্ভুক্ত এবং নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, হাওড়া ইত্যাদি জেলার কতকাংশ দক্ষিণের সমতলভূমির অন্তর্গত। উত্তরের অংশটি অপেক্ষাকৃত ছোট এবং ইহা তিস্তা, জলঢাকা, মহানন্দা প্রভৃতি নদীর পলিমাটি দ্বারা গঠিত। দক্ষিণের অপেক্ষাকৃত বড় অংশটি গঙ্গা-ভাগীরথী নদী-বাহিত পলিমাটি দ্বারা গঠিত উর্বর সমভূমি। এই সমভূমি অপেক্ষাকৃত নীচু। সমভূমির পলিমাটিতে সকলপ্রকার ফসলের চাষ হয়।

৫। **উপকূলের নিম্নভূমি**—২৪ পরগনা জেলার দক্ষিণাংশ এবং মেদিনীপুর জেলার কাঁথি ও তাহার নিকটস্থ উপকূল ভাগ এই অঞ্চলের অন্তর্গত। বঙ্গোপসাগরের তীরের সংলগ্ন নিম্নভূমি প্রায়ই লোনাজল-মগ্ন থাকে। যাহাতে লোনাজল জমিতে প্রবেশ করিতে না পারে সেজন্য জমির চারিদিকে বাঁধ দিয়া এখানে ধানের চাষ হয়। এই নিম্নভূমিতে সুন্দরীবৃক্ষের বন থাকায় ইহার নাম **সুন্দরবন**। সাগরের উপকূলে নদীবাহিত পলিমাটি জমিয়া বহু ছোট বড় দ্বীপের সৃষ্টি করিয়াছে। এই দ্বীপগুলির মধ্যে **সাগর দ্বীপ** ও **ফ্রেজারগঞ্জ** বিখ্যাত। মেদিনীপুরের সমুদ্রোপকূলে এই ধরনের দ্বীপ নাই; কিন্তু অনেক বালিয়াড়ি আছে। সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর **দীঘা** শহরটি এই সমুদ্রসৈকতে অবস্থিত।

দ্বিতীয় পাঠ

মৃত্তিকা

পৃথিবীর পৃষ্ঠে কোন কোন স্থানে কঠিন স্তর আবার কোন কোন স্থানে কোমল স্তর দেখিতে পাওয়া যায়। কঠিন স্তরকে পাথর বা **শিলা** এবং কোমল স্তরকে **মৃত্তিকা** বা মাটি বলা হয়। হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া সূর্যের তাপ, বৃষ্টি, বায়ুপ্রবাহ, জলস্রোত প্রভৃতির ক্রিয়ায় শিলায় শিলায় ঘর্ষণের ফলে কঠিন শিলাস্তর ধীরে ধীরে ভাঙ্গিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া মৃত্তিকায় পরিণত হইয়াছে এবং এই ক্রিয়া এখনো চলিতেছে। শিলা হইতে মাটির উৎপত্তি হইয়াছে।

শিলাচূর্ণ ই মৃত্তিকার উপাদান। শিলাচূর্ণের সঙ্গে মিশিয়া যাইতেছে মৃত জীবজন্তুর হাড় ও গাছপালার গলিত অংশ বা জৈব পদার্থ



মৃত্তিকার উৎপত্তি

(হিউমাস)। আবার অক্সিজেন, কার্বনিক এ্যাসিড গ্যাস, ধাতব লবণ প্রভৃতি রাসায়নিক পদার্থ এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবাণুও শিলাচূর্ণের সঙ্গে

মিশ্রিত হয়। ইহা ছাড়া, বড় বড় গাছের শিকড় অনেক সময়ে শিলাকে চূর্ণ করিয়া মাটিতে পরিণত করে। ছুঁচো, উই, কেঁচো প্রভৃতি কতকগুলি প্রাণীও শিলাকে শিথিল করিয়া মৃত্তিকা উৎপন্ন করে।

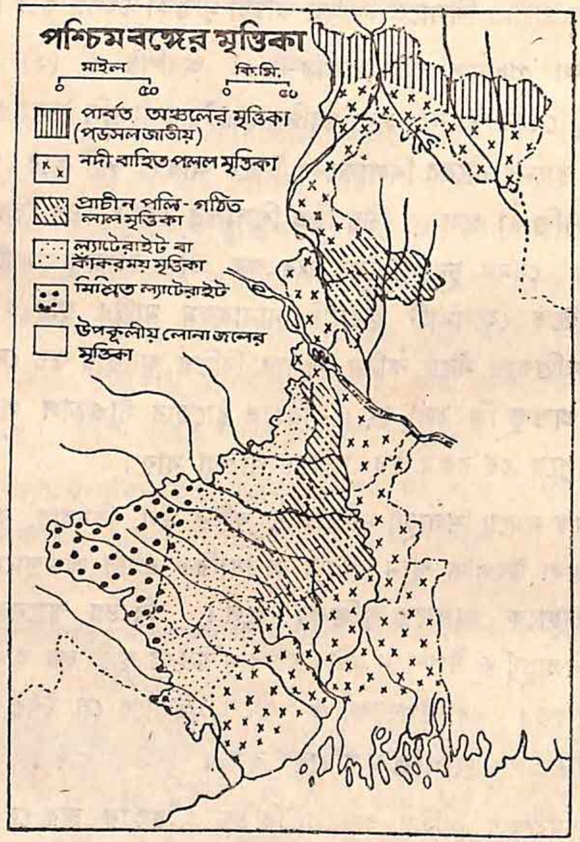
মৃত্তিকা প্রধানত দুই প্রকার—(১) অবশিষ্ট ও (২) অপসৃত মৃত্তিকা। কোন স্থানের শিলা ভাঙ্গিয়া মাটির কণাগুলি তৈয়ারি হইবার পর সেই স্থানেই নীচের শিলাস্তরের উপরে আবরণ সৃষ্টি করে। তাহাকে **অবশিষ্ট মৃত্তিকা** বলে। ভিন্ন ভিন্ন শিলাস্তর হইতে ভিন্ন ভিন্ন মাটির সৃষ্টি হয়। যেমন, চুনাপাথরের স্তর ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া চুনামাটি, বেলে পাথর হইতে বেলেমাটি ইত্যাদি নানারকম মাটির সৃষ্টি হইয়াছে। অবশিষ্ট মৃত্তিকার নীচে কঠিন শিলার বিভিন্ন অবস্থার স্তর দেখা যায়, তাহাকে **অন্তর্ভূমি** বলা হয়। বিহার রাজ্যের সাঁওতাল পরগনা ও ছোটনাগপুরে এই রকম স্তর দেখিতে পাওয়া যায়।

অনেক সময়ে শিলাচূর্ণ নদীস্রোত, বৃষ্টির জল, হিমবাহ, বায়ুপ্রবাহ প্রভৃতি দ্বারা উৎপত্তি স্থান হইতে অপসারিত হইয়া অন্যস্থানে সঞ্চিত হয়। তাহাকে **অপসৃত মৃত্তিকা** বলে। বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন প্রকার শিলাচূর্ণ ও উপদানে এই শ্রেণীর মৃত্তিকার সৃষ্টি হয় বলিয়া ইহা খুব উর্বর হয়। নদী-উপত্যকা ও ব-দ্বীপে এইভাবে যে উর্বর মৃত্তিকার সৃষ্টি হয় তাহাকে **পাললিক মৃত্তিকা** বলে।

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন মৃত্তিকার স্তর দেখা যায়। যথা—

(১) উত্তরদিকে হিমালয়ের **পার্বত অঞ্চলের মৃত্তিকা** কাঁকর মিশ্রিত ও **পড্‌সল** জাতীয়। এই মাটির রং ধূসর ও বাদামী। এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাত বেশী। পর্বতের ঢালু অংশের মাটি হইতে অধিক

পরিমাণে জল গড়াইয়া নিম্নভূমিতে পড়ে। সামান্য পরিমাণ জল মাটির নীচে প্রবেশ করে। তাহার ফলে মাটির মধ্যে চুনের অংশ কমিয়া যায়



মৃত্তিকা

এবং অম্লতা অধিক বৃদ্ধি পায়। অম্লতা শস্যের পক্ষে ক্ষতিকর। সুতরাং এখানকার মাটি অম্লময় ও অনুর্বর। ৫,০০০ ফুটের (১,৫২৫ মি.) অধিক উচ্চে হিমালয় গাত্রে দেবদারু, পাইন, ফার প্রভৃতি সরলবর্গীয়

বৃক্ষ জন্মে। ৩,০০০ হইতে ৪,৫০০ ফুটের (৯১৫—১,৩৭৫ মি.) মধ্যে চা, সিঙ্কোনা, কমলালেবু, আলু ব্যতীত অন্য ফসল ভাল উৎপন্ন হয় না।

(২) **হিমালয়ের পাদদেশে** দার্জিলিং-এর দক্ষিণাংশ এবং জলপাইগুড়ির উত্তরাংশ **তরাই**-এর অন্তর্গত। এখানে পলিমাটি, অপসৃত ও অবশিষ্ট মৃত্তিকা দেখা যায়। এই অঞ্চলে শাল, সেগুন প্রভৃতি পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্য আছে। এই সকল গাছের পাতা ঝরিয়া মাটিতে পড়িয়া পচিতে থাকে। ফলে উৎকৃষ্ট জৈবসারযুক্ত মাটির সৃষ্টি হয়। ঐ মাটির রং বাদামী। পর্বতের উপরকার মাটি অপেক্ষা পাদ-দেশের মাটি উর্বর। মাটির বিভিন্নতার জন্য জলপাইগুড়ি, কুচবিহার প্রভৃতি জেলায় বিভিন্ন ফসল উৎপন্ন হয়।

(৩) পশ্চিমদিকে বাঁকুড়া, বর্ধমান, পুরুলিয়া, বীরভূম ও মেদিনীপুর জেলার পশ্চিমাংশ ছোটনাগপুরের মালভূমির অন্তর্ভুক্ত। **মালভূমি অঞ্চলের** মাঝে মাঝে কঠিন শিলা দ্বারা গঠিত পাহাড় দেখা যায়। এই অঞ্চলের মৃত্তিকা অনুর্বর। অনেক জায়গায় লৌহ মিশ্রিত লাল রং-এর মৃত্তিকা ও কঙ্কর দেখা যায়। এই প্রকার লাল মৃত্তিকাকে **ল্যাটেরাইট** বলে। প্রচুর লৌহমিশ্রিত শিলা রৌদ্র, বৃষ্টি, বায়ু প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে পরিবর্তিত হইয়া অনেক সময়ে এইরূপ লাল মৃত্তিকায় পরিণত হয়। পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমাঞ্চল অসমতল ও শুষ্ক; কৃষিকার্যের পক্ষে উপযোগী নহে। জলসেচের সাহায্যে কিছু ধানের চাষ হয়। ইহা ছাড়া, কিছু কার্পাস, তৈলবীজ ও গম উৎপন্ন হয়।

(৪) পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ও দক্ষিণাংশের সমতল ভূমি গঙ্গানদীর বিস্তীর্ণ ব-দ্বীপের অন্তর্গত এবং **পলি-গঠিত সমভূমি**। এই সমভূমিকে আবার তিনভাগে ভাগ করা যায়। যেমন, (ক) গঙ্গানদীর উত্তরে পশ্চিম দিনাজপুর ও মালদহ জেলা প্রাচীন পলিমাটি দ্বারা গঠিত

ইহা **বরেন্দ্রভূমি** নামে পরিচিত। মৃত্তিকা উর্বর বলিয়া ভূমি কৃষিযোগ্য। এখানে ধান, পাট, তামাক ইত্যাদি ফসল প্রচুর জন্মে। (খ) ভাগীরথী-হুগলী নদীর পশ্চিমে মুর্শিদাবাদের পশ্চিমাংশ, বীরভূম, বর্ধমান জেলার পূর্বাংশ প্রাচীন পলিমাটি দ্বারা গঠিত সমভূমি, ইহাকে **রাঢ়ভূমি** বলে। ইহার অনেকাংশে বালিস্তর দেখা যায়। (গ) গঙ্গানদীর দক্ষিণে এবং ভাগীরথী-হুগলী নদীর পূর্বদিকের অঞ্চল **বাগড়ী** নামে পরিচিত। মুর্শিদাবাদের পূর্বাংশ, সমগ্র নদীয়া ও ২৪ পরগনা জেলা ইহার অন্তর্গত। এই অঞ্চল নূতন পলিমাটি দ্বারা গঠিত সমভূমি। স্থানে স্থানে ব-দ্বীপের পলিমাটি এত গভীর যে, এক হাজার ফুট খুঁড়িলেও কঠিন শিলাস্তর দেখা যায় না। জৈব ও রাসায়নিক পদার্থ এই অঞ্চলের মৃত্তিকার সঙ্গে মিশ্রিত হয় বলিয়া ভূমি উর্বর এবং কৃষিকার্যের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। ইহা ছাড়া, উদ্ভিদ্ সম্পদেও এই অঞ্চল খুব উন্নত।

(৫) **সমুদ্র উপকূলের মাটি** কর্দমাক্ত ও **লবণাক্ত** কিন্তু উর্বর। সুন্দরবনের মাটি এই জাতীয়। এই বনভূমির মাটিতে নানাপ্রকার গাছ জন্মে। ২৪ পরগনা জেলার দক্ষিণাংশ ও মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণ-পূর্বাংশের উপকূলে পলি, কাদা, বালি ও লবণ মিশ্রিত মাটি দেখা যায়। এই অঞ্চলের মাটিতে সুন্দরী, নারিকেল, সুপারি ইত্যাদি গাছ প্রচুর জন্মে।

পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশই পলিমাটি দ্বারা গঠিত। উত্তরবঙ্গে **প্রাচীন পলিমাটি** এবং দক্ষিণবঙ্গে **নবীন পলিমাটি** দেখিতে পাওয়া যায়। এই দুই রকম পলিমাটির মধ্যেও তারতম্য আছে। যেমন, যে পলিমাটিতে শতকরা ৯০ ভাগ বালি এবং ১০ ভাগ কাদা থাকে, তাহাকে **বেলেমাটি** বলা হয়। নদীর চরের মাটি প্রায়ই এই রকম। এই মাটিতে পটল, শশা, তরমুজ প্রভৃতি ফসল ভাল হয়। যে পলিমাটিতে শতকরা

৭০ ভাগ কাদা এবং বাকী অংশে বালি ও জল থাকে, তাহাকে বলে **এঁটেল মাটি**। ব-দ্বীপ অঞ্চলে এই প্রকার মাটি বেশী দেখা যায়। উহা ধান ও পাট চাষের পক্ষে খুব ভাল। যে পলিমাটিতে কাদা ও বালির ভাগ প্রায় সমান থাকে তাহাকে **দোআঁশ মাটি** বলে। এই মাটি খুব উর্বর এবং কৃষিকার্যের পক্ষে উপযোগী। এই মাটিতে ধান, পাট, ভুট্টা, সরিষা, তামাক, ইক্ষু ইত্যাদি জন্মে।

মানুষের জীবন ধারণের পক্ষে মাটির উপযোগিতা খুব বেশী। মানুষের জীবনযাপনের তিনটি প্রয়োজনীয় জিনিস—অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থান মৃত্তিকা হইতেই পাওয়া যায়। মাটিতে চাষ করিয়াই খাদ্য-শস্য ও বস্ত্রের উপাদান কার্পাস পাওয়া যায়। গৃহ নির্মাণের উপাদান কাষ্ঠ যে বৃক্ষ হইতে পাওয়া যায় উহা মাটিতেই জন্মে।

তৃতীয় পাঠ

নদ-নদী

পশ্চিমবঙ্গ একটি নদীমাতৃক রাজ্য। এই রাজ্যের বিভিন্ন অংশে ছোট-বড় বহু নদ-নদী প্রবাহিত। নদীগুলি ঢাল অনুসারে—অর্থাৎ উত্তরের উচ্চভূমি হইতে দক্ষিণের নিম্নভূমিতে এবং পশ্চিমের মালভূমি হইতে পূর্ব বা দক্ষিণ-পূর্বদিকের নিম্নভূমিতে প্রবহমান। পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি নদী উল্লেখযোগ্য, যেমন, গঙ্গা, ভাগীরথী, দামোদর।

গঙ্গা—ইহা পশ্চিমবঙ্গের প্রধান নদী। গঙ্গা বিহার রাজ্যের রাজমহল পাহাড়ের নিকটে পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করিয়া সমভূমির উপর দিয়া দক্ষিণ-পূর্বদিকে প্রবাহিত হইয়াছে। মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ানের

নিকট ইহা দুইটি স্রোতে বিভক্ত হইয়াছে। গঙ্গার মূল প্রবাহ পদ্মা নামে বাংলাদেশে প্রবেশ করিয়াছে। অপর স্রোতটি **ভাগীরথী** নামে দক্ষিণদিকের সমভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। ভাগীরথী প্রায় ৩০০ কি-মি. দীর্ঘ। ভাগীরথীর দক্ষিণ অংশের নাম **হুগলা নদী**।

হুগলী নদীতে পলি পড়িয়া নদীখাত ক্রমেই ভরাট হইয়া আসিতেছে; এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য মুর্শিদাবাদ জেলায় খুলিয়ানের নিকট গঙ্গাবক্ষে **ফরাক্কা বাঁধ** তৈয়ারি হইয়াছে। ইহার ফলে ভাগীরথী-হুগলী নদীতে জল বৃদ্ধি পাইবে। কলিকাতা বন্দরের উন্নতি হইবে।

পদ্মা হইতে শাখানদী **জলঙ্গী** বাহির হইয়া নবদ্বীপের নিকট ভাগীরথী নদীর সহিত মিশিয়াছে। পদ্মার উপনদী **মহানন্দা** হিমালয় হইতে বাহির হইয়া দার্জিলিং ও পশ্চিম দিনাজপুর জেলার পশ্চিমভাগে প্রবাহিত হইবার পর মালদহ জেলার মধ্যদিয়া বহিয়া বাংলাদেশে পদ্মানদীতে পড়িয়াছে।

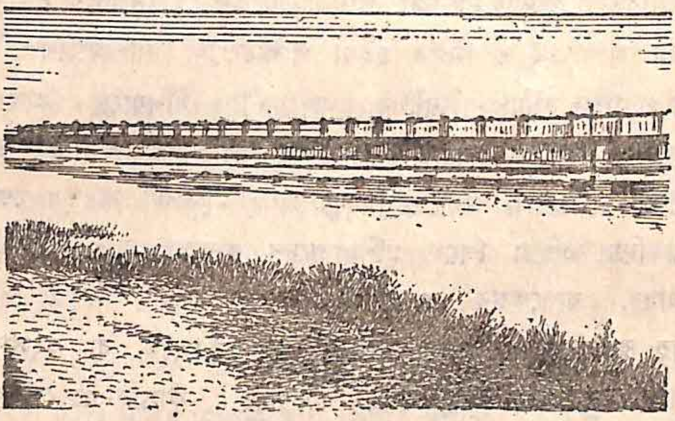
তোর্সা, সংকোশ, জলঢাকা, তিস্তা, করতোয়া, আত্রেয়ী প্রভৃতি নদী হিমালয়ের পার্বত অঞ্চল হইতে নির্গত হইয়া দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কুচবিহারের মধ্যদিয়া প্রবাহিত হইয়া বাংলাদেশের যমুনা নদীতে পড়িয়াছে। এই সমস্ত নদী হিমালয়ের বরফগলা জল ও বৃষ্টির জল দ্বারা পরিপুষ্ট বলিয়া সারাবৎসর জলপূর্ণ থাকে। পার্বত অঞ্চলে ইহারা খরস্রোতা কিন্তু সমভূমি অঞ্চলে ইহারা নৌবাহনোপযোগী। খরস্রোত জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের পক্ষে সহায়ক। জলঢাকা নদীর খরস্রোত হইতে বিদ্যুৎ উৎপাদন করিয়া উত্তরবঙ্গে শিল্প কারখানায়

বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হইতেছে এবং কৃষিভূমিতে জলসেচের ব্যবস্থা হইয়াছে।

ব্রাহ্মণী, ময়ূরাক্ষী, অজয়, দামোদর, রূপনারায়ণ, কাঁসাই (কংসাবতী) প্রভৃতি নদ-নদী পশ্চিম দিকের ছোটনাগপুর মালভূমির বিভিন্ন অংশ হইতে নির্গত হইয়া পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমাংশের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া ভাগীরথী বা হুগলী নদীতে মিশিয়াছে। অজয় নদ বীরভূম ও বর্ধমান জেলার সীমারেখার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া ভাগীরথী বা হুগলী নদীতে মিশিয়াছে। ময়ূরাক্ষী বীরভূম জেলার উপর দিয়া বহিয়া গিয়া মুর্শিদাবাদের **দ্বারকা** নদে পড়িয়াছে। দামোদর, দ্বারকেশ্বর ও শিলাবতী বা শিলাই নদীর মিলিত প্রবাহ **রূপনারায়ণ। রূপনারায়ণ** এবং **কাঁসাই** বা **কংসাবতী** কলিকাতার দক্ষিণে হুগলী নদীতে পড়িয়াছে। কাঁসাই-এর শেষাংশের নাম **হলদী** নদী। এই সকল নদী বর্ষার জলে পুষ্ট। বর্ষাকালে এই সকল নদী দিয়া প্রচুর পরিমাণ জল ভাগীরথী-হুগলীতে আসিয়া পড়ে। কিন্তু ঐসময়ে মালভূমি অঞ্চলের বালি, পলি ইত্যাদি এই সকল নদীতে পড়ে বলিয়া উহাদের খাত ভরাট হইয়া যায়। সেই কারণে নদীগুলিতে প্রায়ই বন্যা হয়। প্রতি বৎসর দামোদর নদে প্রবল বন্যার সৃষ্টি হয়। ফলে ফসল, লোক ও পশুর জীবন হানি এবং দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা থাকে। এই সকল কারণে দামোদরকে "দুঃখের নদী" বলা হয়। পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলায় **দুর্গাপুর ব্যারেজ** (সেচবাঁধ) নির্মাণ করিয়া বন্যা-নিয়ন্ত্রণ, বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদন, জলসেচ প্রভৃতির ব্যবস্থা হইয়াছে।

বীরভূম জেলার সিউড়ি শহরের নিকটে তিলপাড়ায় ময়ূরাক্ষী নদীর উপর **ব্যারেজ (সেচবাঁধ)** নির্মাণ করা হইয়াছে এবং সেচখালের

সাহায্যে মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম জেলায় চাষের জমিতে জল সরবরাহ এবং জল-বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করিয়া কলকারখানা ও অন্যান্য কাজের জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হইতেছে। বাঁকুড়ায় **কংসাবতীতে** বাঁধ



দুর্গাপুর ব্যারেজ

দিয়া চাষের জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা হইয়াছে। নদী-পরিকল্পনার ফলে জলসেচ ব্যবস্থার উন্নতি হওয়ায় এই রাজ্যে কৃষির উন্নতি হইয়াছে। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের নদীগুলি কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতির পক্ষে বিশেষ সহায়ক।

সুবর্ণরেখা নদীর কতকাংশ মেদিনীপুর জেলার উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া উড়িষ্যা রাজ্যের সীমান্তে বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। **ইছামতী, কালিন্দী, পিয়ালী, মাতলা, বিদ্যাধরী, গোসাবা, রায়মঙ্গল** প্রভৃতি কয়েকটি নদী ২৪ পরগনা জেলার উপর দিয়া দক্ষিণের ব-দ্বীপ অংশে প্রবাহিত হইয়াছে। ইহারা জোয়ারের জলে পুষ্ট। এই সকল নদীমুখে অসংখ্য খাড়ি ও ছোট বড় দ্বীপ আছে।

চতুর্থ পাঠ

জলবায়ু*

কোন দেশের জলবায়ু বলিতে আমরা সাধারণত বুঝি—সেই দেশে বৎসরের কোন্ কোন্ সময় কি পরিমাণ বৃষ্টিপাত হয়, বায়ুর তাপ কি পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধি পায় এবং শীত ও গ্রীষ্মের তারতম্য কত। পশ্চিম-বঙ্গের উত্তরাংশে হিমালয়ের পার্বত অঞ্চলে শীতের প্রকোপ বেশী। এমন কি, শীতকালে কোন কোন সময় দার্জিলিং-এ তুষারপাতও হয়। কিন্তু গ্রীষ্মকালে এই অঞ্চলের জলবায়ু খুবই আরামদায়ক ও স্বাস্থ্যকর এবং সমতলভূমি অপেক্ষা গরমের মাত্রা অনেক কম থাকে। অন্যদিকে, দক্ষিণে সমুদ্রের উপকূলবর্তী অঞ্চলের জলবায়ু বৎসরের সমস্ত সময় প্রায় একই রকম থাকে। মেদিনীপুর জেলায় সমুদ্রের উপকূলে অবস্থিত **দীঘা** একটি স্বাস্থ্যকর স্থান। এই রাজ্যের পশ্চিমাংশের জলবায়ু অপেক্ষাকৃত উষ্ণ ও শুষ্ক।

পশ্চিমবঙ্গের সমতলভূমিতে গ্রীষ্মের গড় উষ্ণতা ৮০°—১১০° ফা. (২৪·৪° সে.—৪৩·৫° সে.) কিন্তু শীতকালে তাপমাত্রা ৫৫°—৬৫° (১২·৭° সে.—১৮·৬° সে.) ফা.-এর মধ্যে থাকে।

গ্রীষ্মকালে সমুদ্র হইতে শীতল বায়ু প্রচুর জলীয় বাষ্প আহরণ করিয়া স্থলভাগের দিকে বহিতে থাকে। তাহার ফলে এই রাজ্যে

---

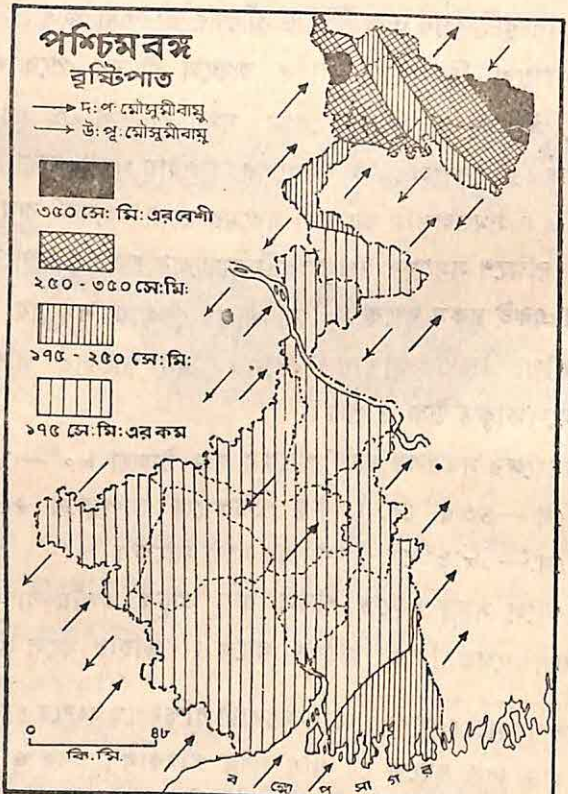
*ভারত সরকারের আবহ বিভাগ অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে বৎসরে চারিটি **ঋতু**ঃ

(ক) মার্চ মাস হইতে মে মাস পর্যন্ত গ্রীষ্মকাল; বসন্ত ও গ্রীষ্ম একই সময়ের মধ্যে।

(খ) জুন মাস হইতে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত মৌসুমী বায়ুর আগমন কাল; বর্ষা ও শরৎকাল এই সময়ের মধ্যে।

(গ) অক্টোবর ও নভেম্বর মাস মৌসুমী বায়ুর প্রত্যাগমন কাল; হেমন্ত ও শীতকালের আরম্ভ এই সময়ে এবং (ঘ) ডিসেম্বর হইতে ফেব্রুয়ারী মাস শীতকাল।

প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। শীতকালে জলীয় বাষ্পশূন্য শীতল বাতাস এই রাজ্যের স্থলভাগের উপর দিয়া বহিতে থাকে বলিয়া সেই সময় বৃষ্টিপাত প্রায় হয় না বলিলেই চলে।



পশ্চিমবঙ্গের বৃষ্টিপাত

গ্রীষ্ম ও শীত এই দুই ঋতুতে যে বাতাস বহিতে থাকে তাহাকে **মৌসুমী বায়ু** বলে। 'মৌসিম' কথাটির অর্থ ঋতু। গ্রীষ্মকালে এই বায়ু সমুদ্রের দক্ষিণ-পশ্চিম দিক হইতে আসে বলিয়া উহাকে বলা হয়

দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু বা **গ্রীষ্মের মৌসুমী বায়ু**। আবার, শীতকালে স্থলভাগের উত্তর-পূর্ব দিক হইতে যে বায়ু সমুদ্রের দিকে বহিতে থাকে, উহাকে বলা হয় **উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ু** বা **শীতের মৌসুমী বায়ু**। উষ্ণ ও আর্দ্র গ্রীষ্মকাল এবং শীতল ও শুষ্ক শীতকাল পশ্চিমবঙ্গের জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য।

পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র সমপরিমাণ বৃষ্টিপাত হয় না। গ্রীষ্মের আর্দ্র মৌসুমী বায়ু হিমালয়ের গাত্রে বাধা পায় বলিয়া দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলায় ১২০″ ইঞ্চির (৩০৫—৩৮৪ সে-মি.) অধিক বৃষ্টিপাত হয়। কিন্তু বৃষ্টিপাতের পরিমাণ দক্ষিণে ও পশ্চিমে অপেক্ষাকৃত কম। দক্ষিণে সুন্দরবন অঞ্চলে ৮০″ ইঞ্চি (২০৩ সে-মি.), কলিকাতায় ৬৩″ ইঞ্চি (১৬০ সে-মি.) এবং পশ্চিমে বাঁকুড়া, বীরভূম, পুরুলিয়া জেলায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৫০″—৫৫″ ইঞ্চি (১২৭—১৪০ সে-মি.) মাত্র। আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসেই অধিক বৃষ্টিপাত হয়। এই দুইটি মাস পশ্চিমবঙ্গে বর্ষাকাল। প্রবল বর্ষণের ফলে এই সময়ে রাজ্যের তাপমাত্রা অনেকটা কমিয়া যায় এবং ভূমি উর্বর ও চাষোপযোগী হয়। পশ্চিমবঙ্গে চৈত্র-বৈশাখ মাসে সন্ধ্যার দিকে একপ্রকার ঝোড়ো হাওয়া বহে, তাহাকে **কালবৈশাখী** বলে। আশ্বিন মাসেও ঐ প্রকার ঝোড়ো বাতাস বহিয়া থাকে; তাহাকে **আশ্বিনের ঝড়** বলা হয়।

সমুদ্র নিকটে থাকিবার ফলে পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণাংশের সমতল ভূমিতে শীত ও গ্রীষ্ম তেমন প্রখর হয় না। উচ্চতার জন্য উত্তরাংশের পার্বত অঞ্চল শীতল। **দার্জিলিং, কালিম্পং, কার্সিয়াং** প্রভৃতি শীতল ও স্বাস্থ্যকর স্থান।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম পাঠ

উৎপন্ন দ্রব্য

অরণ্য

অরণ্য-সম্পদ—অরণ্য বিভিন্ন প্রকারে দেশের উপকার সাধন করে। অরণ্যের বৃক্ষলতা ভূমিক্ষয় নিবারণ করে, দেশে বৃষ্টিপাতে সাহায্য করে, বায়ু হইতে দূষিত অঙ্গার গ্রহণ করে ও বায়ুতে স্বাস্থ্যপ্রদ অম্লজান প্রদান করে। বাড়িঘর, আসবাবপত্র ও অন্যান্য বহুবিধ দ্রব্য তৈয়ারির কাষ্ঠ অরণ্য হইতেই সংগ্রহ করা হয়। উদ্ভিজ্জ সার, কয়লা, নানাপ্রকার ঔষধি, মধু, মোম অরণ্যেরই দান। প্রকৃতির শোভা নানা রকম পশুপক্ষির আশ্রয়ও এই অরণ্য। এইসব প্রাণী হইতেও নানা ভাবে মানুষ উপকৃত। বৃক্ষের সুমধুর ফলরাশি অরণ্যের বৃক্ষাদি হইতেই জাত। এইসব কারণে অরণ্যকে দেশের একটি সম্পদ বলা হয়।



পাইন গাছ

গ্রীষ্মকালীন মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে পশ্চিমবঙ্গে যে বৃষ্টিপাত হয় তাহারই ফলে গাছপালা জন্মে এবং ঘন বনের সৃষ্টি হয়। এই রাজ্যে প্রায় নয় হাজার বর্গ কিলোমিটার বনভূমি আছে। তাহার অধিকাংশই

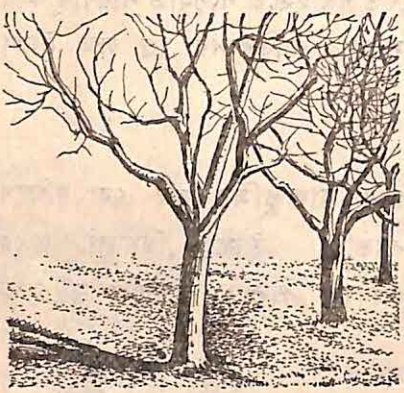
সরকারের সংরক্ষিত। বনভূমির আয়তন বৃদ্ধি করিবার জন্য সরকার প্রতিবৎসর **বন-মহোৎসবের** আয়োজন করেন। সেই সময় পরিকল্পিত ভাবে বৃক্ষরোপণ করা হয়। এইসমস্ত বন হইতে সংগৃহীত সারবান্ কাঠ এবং জ্বালানি কাঠ বিক্রয় করিয়া সরকার প্রতিবৎসর বহু লক্ষ টাকা উপার্জন করেন।

উত্তরে **তরাই**-এর **বন,** পশ্চিমে **মালভূমির বন** এবং দক্ষিণে **সুন্দরবন** পশ্চিমবঙ্গের প্রধান বনভূমি। উত্তরে হিমালয়-গাত্রের উচ্চ অংশে **পাইন, ফার, দেবদারু** প্রভৃতি **সরলবর্গীয় বৃক্ষ** জন্মে। আরও অধিক উর্ধ্বে আল্পীয় বনভূমি ও রডোডেনড্রন গাছ দেখা যায়। দেবদারু ও পাইন জাতীয় গাছের রস হইতে তার্পিন তৈল, রজন এবং কাঠ হইতে প্যাকিং বাক্স, দিয়াশলাইয়ের কাঠি ইত্যাদি তৈয়ারি হয়। এখানে সিঙ্কোনা গাছের চাষ হয়। এই গাছের বাকল হইতে কুইনাইন প্রস্তুত হয়। হিমালয় পর্বতের পাদদেশে তরাই ও ডুয়ার্স অঞ্চলের চির হরিৎ বৃক্ষের মিশ্র বনভূমিতে শাল, সেগুন, গর্জন, জারুল, শিশু, খয়ের, হলদু, বাঁশ, বট, অশ্বত্থ প্রভৃতি গাছ জন্মে। ইহারা **পর্ণমোচী** বৃক্ষ অর্থাৎ শীতকালে ইহাদের পাতা ঝরিয়া পড়ে। **সেগুন, শাল, শিশু** প্রভৃতি মূল্যবান কাষ্ঠ দ্বারা গৃহের নানারকম আসবাব তৈয়ারি



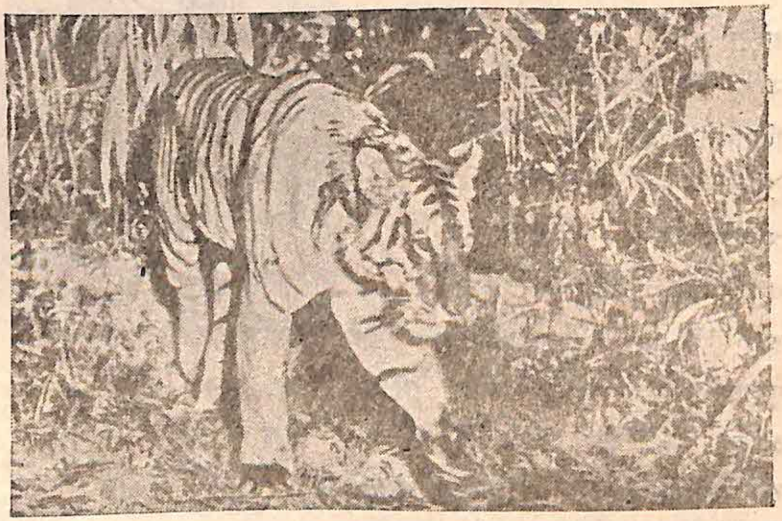
ফার

হয়। জ্বালানি হিসাবেও এই সমস্ত কাঠ প্রচুর ব্যবহৃত হয়। বাঁশ ও বেতের সাহায্যে নানারকম আসবাবপত্র তৈয়ারি হয়।



পর্ণমোচী বৃক্ষ

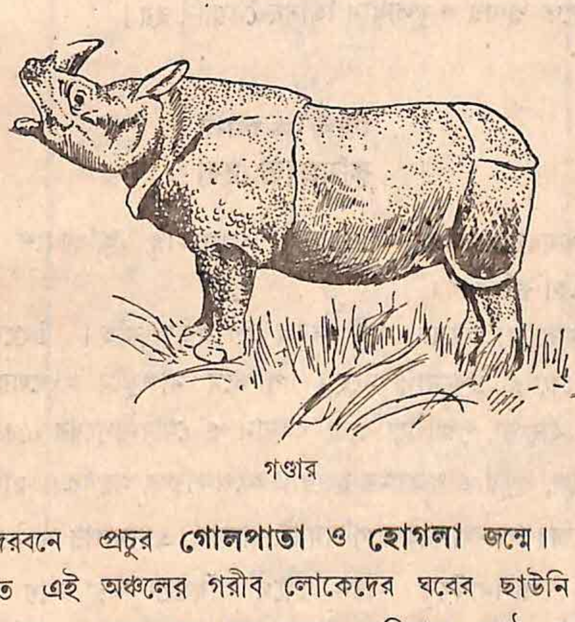
এই রাজ্যের পশ্চিমে বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, পুরুলিয়া প্রভৃতি জেলায় যে **বন-জঙ্গল** দেখা যায়, তাহাতে শাল, মহুয়া, শিমুল, পলাশ, কুসুম, কুল, বাবলা প্রভৃতি গাছ বেশী জন্মে। **পলাশ, কুল** প্রভৃতি গাছে লাক্ষা-কীটের চাষ হয়। লাক্ষা-কীটের দেহ হইতে একপ্রকার আঠার মত রস



রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার

বাহির হয়। উহা দ্বারা গালা তৈয়ারি হয়। বাঁকুড়া, বীরভূম ও মালদহ প্রভৃতি জেলায় **তুঁত** গাছে রেশম-কীটের চাষ হয়।

পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণে ২৪ পরগনা জেলার **সুন্দরবন** অঞ্চলে সুন্দরী, গরাণ, গর্জন, শিমুল, গেঁউয়া, জারুল, ছাতিম; পিটুলী, বাঁশ, বেত, কেয়া প্রভৃতি গাছ প্রচুর জন্মে। **সুন্দরী** কাঠ গাঢ় লাল, শক্ত ও মূল্যবান। গর্জন ও গরাণ কাঠও যথেষ্ট দামী। এই সকল ম্যানগ্রোভ জাতীয় শক্ত কাঠ আসবাবপত্র তৈয়ারি করিতে ব্যবহৃত হয়। শিমুল, গেঁউয়া, জারুল, ছাতিম, পিটুলী প্রভৃতি গাছ হইতে দিয়াশলাইয়ের কাঠি তৈয়ারি হয়। সুন্দরবনের নানারকম কাঠ জ্বালানি হিসাবেও ব্যবহৃত হয়।



গণ্ডার

সুন্দরবনে প্রচুর **গোলপাতা** ও **হোগলা** জন্মে। এইগুলি সাধারণত এই অঞ্চলের গরীব লোকেদের ঘরের ছাউনি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এখানকার বনে প্রচুর পরিমাণে কাষ্ঠ, মধু, মোম, নারিকেল ও সুপারি পাওয়া যায়।

তরাই-এর অরণ্যে এবং সুন্দরবনে বাঘ, চিতাবাঘ, নেকড়ে, ভালুক, গণ্ডার, হাতী, বাইসন, গয়াল, বন্য মহিষ, শূকর, কুকুর, বিড়াল, সম্বর, নানাজাতের হরিণ প্রভৃতি জন্তু বাস করে। তরাই-এর বনে চিতাবাঘ, ভালুক, বানর, সাপ ও নানারকম পাখীও আছে। জলদাপাড়ার অরণ্যে অনেক গণ্ডার দেখা যায়। সুন্দরবনে **'রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার'** নামক হিংস্র ব্যাঘ্র বাস করে। গভীর অরণ্যে সর্পাদি সরীসৃপ, গোসাপ এবং জলাভূমিতে কুমীর দেখা যায়। অরণ্যের পশুদের মধ্যে কোন কোন পশু মানুষের কাজে লাগে। হাতী ভারী মাল টানে। হরিণ ও গণ্ডারের শিং ও চামড়া এবং হাতীর দাঁত হইতে সুন্দর ও মূল্যবান জিনিস তৈয়ারি হয়।

দ্বিতীয় পাঠ
কৃষিজাত দ্রব্য

পশ্চিমবঙ্গ কৃষিপ্রধান রাজ্য। এখানকার অধিকাংশ লোকের উপজীবিকা কৃষিকার্য।

এই রাজ্যে চাষের মাটি সর্বত্র একপ্রকার নহে। উত্তরে পার্বত অঞ্চল চাষের উপযোগী নহে। পশ্চিমে মালভূমি অঞ্চলের—অর্থাৎ বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া এবং বর্ধমান ও মেদিনীপুরের একাংশের—মাটি লাল, বন্ধুর ও কঙ্করময় হওয়ায় অপেক্ষাকৃত অনুর্বর। দক্ষিণাংশের সমভূমি অঞ্চলে নদীবাহিত পলিমাটি থাকায় এখানকার ভূমির উর্বরতা অধিক। পলিমাটিকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা—বেলেমাটি, এঁটেল মাটি ও দোআঁশ মাটি। বেলে মাটিতে আলুর চাষ ভাল হয়। এঁটেল মাটি ধান, পাট প্রভৃতি চাষের পক্ষে উপযোগী।

দোআঁশ মাটিতে পলি, বালি ও কাদা প্রভৃতি মেশানো থাকে। এই মাটিতে গম, যব, আখ, তূলা প্রভৃতি ভাল জন্মে।

পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সমান নহে। বৃষ্টিপাতের তারতম্য অনুসারে বিভিন্ন স্থানের ভূমির উর্বরতারও তারতম্য ঘটে।



কৃষিজাত দ্রব্য

গ্রীষ্মকালে মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে প্রায় সর্বত্রই প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় বলিয়া সেই সময় ধান, পাট ইত্যাদি **খারিফ শস্যের** চাষ হইয়া থাকে।

শীতকালে পশ্চিমবঙ্গে স্বল্প বারিবর্ষণ হয়। সে সময় তৈলবীজ, গম, কলাই প্রভৃতি **রবিশস্যের** চাষ হয়।

পশ্চিমবঙ্গের কৃষিজাত দ্রব্যগুলিকে মোটামুটি হিসাবে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা—



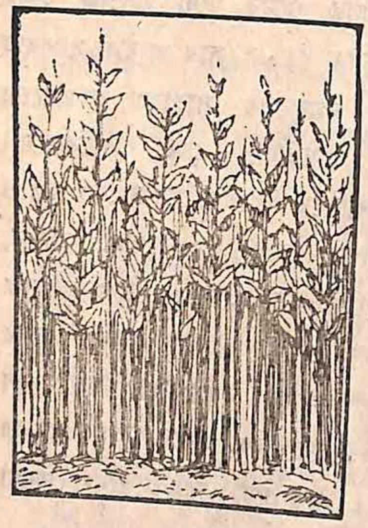
ধান

১। খাদ্যশস্য

ধান ঃ এই রাজ্যের প্রধান খাদ্য শস্য **ধান**। ধান হইতে চাউল পাওয়া যায় এবং চাউল সিদ্ধ করিয়া ভাত প্রস্তুত হয়। বাঙ্গালীদের প্রধান খাদ্য ভাত। এই রাজ্যের পলিমাটিযুক্ত উর্বর সমভূমিতে অনুকূল বৃষ্টিপাত এবং উষ্ণ আবহাওয়ার জন্য প্রচুর ধান জন্মে। রাজ্যের প্রায় সর্বত্রই অল্প বিস্তর ধান উৎপন্ন হয়। শতকরা ৭৫ ভাগ চাষের জমিতে ধানের চাষ হয়। দার্জিলিং-এর পর্বত গাত্রেও কিছু ধানের চাষ হয়। চাষের সময় অনুসারে এখানে তিনরকমের ধান উৎপন্ন হয়। যথা, **আউশ, আমন** ও বোরো। আউশ ধানের বীজ বোনা হয় বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে এবং শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে ফসল তোলা হয়। আমন ধানের চারা রোয়া হয় শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে এবং অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে ধান কাটা হয়। বোরো ধানের বীজ বোনা হয় পৌষ মাসে এবং বৈশাখ

মাসে ধান কাটা হয়। এই তিনপ্রকার ধানের মধ্যে **আমন** ধানই প্রধান শস্য। বর্তমানে সরকার উন্নত ধরনের সার ও বীজ সরবরাহ করিয়া এবং বিদ্যুৎ-চালিত গভীর নলকূপের সাহায্যে জলসেচের ব্যবস্থা করিয়া এই ধানের ফলন বাড়াইবার চেষ্টা করিতেছেন। সেচ পরিকল্পনা ব্যতীত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উন্নত ধরনের চাষের চেষ্টাও করা হইতেছে। এই রাজ্যে মেদিনীপুর, হুগলী, ২৪ পরগনা, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিম দিনাজপুর, নদীয়া, কুচবিহার প্রভৃতি জেলায় প্রচুর ধান উৎপন্ন হয়। মেদিনীপুর, বর্ধমান ও ২৪ পরগনায় আমন ধানের চাষ বেশী হয়। পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধান জন্মে। ধান হইতে মুড়ি, চিড়া, খই ইত্যাদিও প্রস্তুত হয়। ধানের খড় বা বিচালি গরু, মহিষের খাদ্য। খড় দিয়া ঘরের ছাউনিও দেওয়া হয়।

মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর ও বাঁকুড়ায় কিছু কিছু **গমের** চাষ হয়। শীতকালেই গমের চাষ হয় এবং দোআঁশ মাটিতেই গমের ফলন ভাল হয়। বেশী বৃষ্টি বা গরমে গমের চাষ ভাল হয় না। আজকাল গমের চাষ বাড়িয়া গিয়াছে। গমের জমিতে **যব**ও হয়। পর্বতের ঢালু অংশের পলিমাটিতে **ভুট্টার** চাষ ভাল হয়। **আখ** এই রাজ্যের প্রায় সব জেলাতেই অল্প-বিস্তর উৎপন্ন হয়। বাঙ্গালীর অন্যতম খাদ্য-শস্য **কলাই**-এর চাষ শুষ্ক অঞ্চলেই ভাল হয়। মুর্শিদাবাদ, মালদহ, বীরভূম ও নদীয়া জেলায় মুগ, মসুর, ছোলা, অড়হর, মাষ, মটর প্রভৃতি কলাই-এর চাষ বেশী হয়। বর্ধমান, হুগলী ও হাওড়া জেলায় এবং দার্জিলিং-এর পার্বত অঞ্চলে **আলুর** চাষ হয়। এই রাজ্যে আলুর ফলন বাড়িতেছে এবং হিম ঘরে আলু সংরক্ষিত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

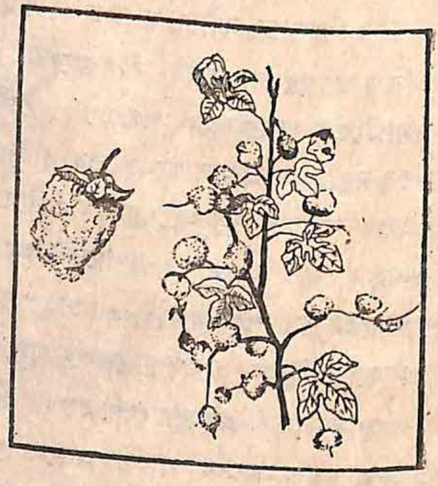


পাট

২। তন্তুময় উদ্ভিদ্

ধানের পরেই এই রাজ্যের উল্লেখযোগ্য কৃষিজাত দ্রব্য **পাট**। ভারতে উৎপন্ন পাটের বেশীর ভাগ পশ্চিমবঙ্গেই জন্মে। ইহাই এই রাজ্যের প্রধান অর্থকরী ফসল। আর্দ্র জলাবায়ু, মাঝারি ধরনের উত্তাপ ও পলিমাটি পাট চাষের পক্ষে বিশেষ অনুকূল। পাটগাছ কিছু বড় হইবার পর জমি বর্ষার জলে প্লাবিত থাকিলে ভাল হয়।

পাট কাটিবার পর কিছুদিন জলে ভিজাইয়া পচাইতে হয়। পরে পাকাটি হইতে তন্তুগুলি ছাড়াইতে হয়। ভাগীরথী বা হুগলী নদীর দুই তীরে, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, হুগলী, হাওড়া, ২৪ পরগনা জেলায় এবং কুচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলার সমতল ভূমিতে পাট উৎপন্ন হয়। দেশ বিভাগের ফলে উৎকৃষ্ট পাট উৎপাদনের জেলাগুলি বাংলাদেশের (ভূতপূর্ব পূর্ব পাকিস্তানের) মধ্যে পড়ে। কিন্তু



তূলা

পাটকলগুলি প্রায় সবই পশ্চিমবঙ্গে রহিয়া যায়। এই পাটকলগুলি চালু রাখিবার জন্য ভারত সরকার পাট-চাষ বাড়াইবার চেষ্টা করিতেছেন। চট, থলে, কার্পেট, দড়ি, বস্ত্র, আসন প্রভৃতি পাটজাত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করিয়া সরকার প্রচুর বিদেশী মুদ্রা অর্জন করেন।

পশ্চিমবঙ্গে পাটজাতীয় তন্তু **মেস্তার** চাষও হয়। পাটের সঙ্গে মেস্তা মিশাইয়া পাটকলে ব্যবহার করা হয়।

মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও ২৪ পরগনা জেলায় **তুলার** চাষ হয়। তবে, পশ্চিমবঙ্গের কাপড়ের কলগুলির চাহিদা মিটাইবার মত তূলা এখানে উৎপন্ন হয় না।

৩। অন্যান্য ফসল

তৈলবীজ ঃ পশ্চিমবঙ্গে উৎপন্ন তৈলবীজের মধ্যে **সরিষা, রাই, তিল, চিনাবাদাম** ও **তিসির** নাম উল্লেখযোগ্য। এইসকল তৈল-বীজ হইতে তৈল নিষ্কাষণ করা হয়। বাঁকুড়া, মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর ও নদীয়া জেলাতে তৈলবীজের চাষ বেশী হয়। আজকাল হাওড়া ও মেদিনীপুর জেলায় তৈলবীজ হিসাবে সূর্যমুখীর চাষ হইতেছে।



চা

চা ঃ জলপাইগুড়ি জেলার ডুয়ার্স অঞ্চলে এবং দার্জিলিং জেলার পর্বতের ঢালে অনেক চা-বাগান আছে। যেখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় অথচ জল দাঁড়ায় না, সেই সমস্ত জায়গায় চা-এর চাষ ভাল হয়। চা গাছ হইতে উহার শাখার একটি কুঁড়ি ও দুইটি কচি পাতা তুলিয়া লওয়া হয়। আমরা যে চা

পান করি তাহা চা-গাছের ঐ অংশ হইতেই তৈয়ারি হয়। চা বিদেশে রপ্তানি হয় এবং ইহা প্রচুর বিদেশী মুদ্রা অর্জন করে। দার্জিলিং জেলায় উৎপন্ন চা স্বাদে, গন্ধে ও বর্ণে পৃথিবীর মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট।

ইক্ষুঃ মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, নদীয়া, বর্ধমান, মালদহ, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলার দোআঁশ মৃত্তিকায় ইক্ষুর চাষ হয়। ইক্ষুর রস হইতে চিনি, গুড় ইত্যাদি তৈয়ারি হয়।

তামাকঃ জলপাইগুড়ি, কুচবিহার, পশ্চিম দিনাজপুর, নদীয়া ও বাঁকুড়া জেলায় তামাক বেশী উৎপন্ন হয়। শীতকালে তামাকের চাষ হয়। হাওড়া, হুগলী ও ২৪ পরগনা জেলায় প্রচুর **পানের চাষ হয়।** দার্জিলিং-এর নিকট মংপুতে **সিঙ্কোনার** চাষ হয়। সিঙ্কোনার বাকল হইতে কুইনাইন প্রস্তুত হয়। মুর্শিদাবাদ, বীরভূম ও বাঁকুড়া জেলায় **রেশম**কীটের খাদ্য হিসাবে **তুঁত** গাছের এবং বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলায় **লাক্ষা**কীটের আশ্রয় হিসাবে কুল, পলাশ ও কুসুম গাছের চাষ হয়। লাক্ষাকীটের দেহনিঃসৃত রস হইতে গালা প্রস্তুত হয়। গালা কাঠের আসবাব-পত্র পালিশ করিতে, গ্রামোফোন রেকর্ড ও স্বর্ণকার-গণের অলঙ্কার তৈয়ারি এবং ডাকঘর ও বিভিন্ন সংস্থায় পার্সেল বা চিঠিপত্র সীলমোহর করার কাজে ব্যবহৃত হয়।

এই রাজ্যের মসলাজাতীয় শস্যের মধ্যে **আদা, লঙ্কা, হলুদ, ধনিয়া, পেঁয়াজ, এলাচি, দারুচিনি** ও **তেজপাতার** নাম করা যায়। সুমিষ্ট ফলের মধ্যে দার্জিলিং জেলার **কমলালেবু** এবং মুর্শিদাবাদ ও মালদহের **আম** বিখ্যাত। এতদ্ব্যতীত পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেক জেলায় আম, কাঁঠাল, কলা, পেঁপে, লিচু, আনারস, শশা, পেয়ারা ইত্যাদি ফলের গাছ জন্মে। সমুদ্রোপকূলের লোনা মাটিতে নারিকেল গাছ বেশী জন্মে।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রথম পাঠ

গৃহপালিত পশু

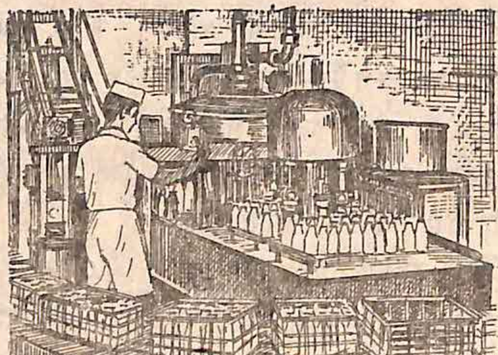
পশ্চিমবঙ্গের নানা অঞ্চলে নানাপ্রকার জীবজন্তু দেখা যায়। বাঘ, চিতাবাঘ, ভালুক প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর সহিত মানুষের খাদ্য-খাদক সম্পর্ক এবং মানুষ যথাসম্ভব এই সব ভয়াল জন্তু হইতে নিরাপদ দূরত্বে থাকে। কিন্তু কতকগুলি জন্তু নানাভাবে মানুষের উপকার করে। সেই সকল জন্তুকে মানুষ বাড়িতে প্রতিপালন করে। এই জাতীয় জন্তুদের মধ্যে গোরু, মহিষ, ছাগল, মেষ, ঘোড়া, শূকর, গাধা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

এই রাজ্যে গোরু ও মহিষের সংখ্যা অধিক। ষাঁড়, বলদ ও মহিষ চাষ-আবাদের কাজে লাঙ্গল টানিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। বলদ এবং ঘোড়া গাড়ি টানে। হাতী, খচ্চর, গাধা প্রভৃতি জন্তু ভার বহনের জন্য ব্যবহৃত হয়। তেলের ঘানি টানিতে এবং কূপ হইতে জল তুলিতেও গবাদি পশু মানুষকে সাহায্য করে।

গোরু, মহিষ ও ছাগলের দুগ্ধ পুষ্টিকর খাদ্য। কোন কোন জন্তুর মাংস খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং তাহাদের চামড়া, শিং, হাড় ও দাঁত আমাদের নানাবিধ প্রয়োজন মিটাইয়া থাকে। ধান মাড়াইবার কাজে গোরু ব্যবহৃত হয়, গোময় কৃষিকার্যে উৎকৃষ্ট সার এবং গোময়ের শুখনা চাকতি (ঘুঁটে) জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পার্বত অঞ্চলে মেষ পালন করা হয়। মেষের লোম হইতে পশমজাত নানাবিধ শীতবস্ত্রাদি তৈয়ারি হয়। সমতল অঞ্চলে শূকর পালিত হয়। শূকর হইতে মাংস ও চর্বি পাওয়া যায়।

পশ্চিমবঙ্গে ৮০ লক্ষ গবাদি পশু আছে। কিন্তু উপযুক্ত গোচারণ ভূমির অভাববশত গবাদি পশুর পরিচর্যা ভাল হয় না। যথেষ্ট তৃণভূমি না থাকায় এবং ভূষি, খইল প্রভৃতি পশু-খাদ্যের অভাবে গবাদি পশু ক্রমশ দুর্বল হইয়া যাইতেছে। ইহার ফলে দুধের পরিমাণ ও সার কমিয়া যাইতেছে। যে-সমস্ত পশু হইতে দুধ পাওয়া যায় জনকল্যাণের স্বার্থে বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে সেই সমস্ত পশুর পুষ্টি বাড়ানো প্রয়োজন। রাজ্য সরকার বর্তমানে এ-বিষয়ে মনোযোগী হইয়াছেন।

যাহাতে সুস্থ, দুগ্ধবতী গাভীদের খাদ্যের অকুলান না হয় সেজন্য বৃদ্ধ ও অকর্মণ্য গবাদি পশুকে পৃথকভাবে **গোসদনে** রাখা হয়। স্থানে স্থানে পশু চিকিৎসালয়ও স্থাপিত হইয়াছে।



হরিণঘাটার দুগ্ধকেন্দ্র

নদীয়া জেলায় **হরিণঘাটায়** এবং কলিকাতায় **বেলগাছিয়া**-নামক স্থানে পশুপালন কেন্দ্র এবং দুগ্ধ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। দুগ্ধ কেন্দ্র হইতে শোধন করা দুধ এবং দুগ্ধজাত-দ্রব্য শহরের নানাস্থানে

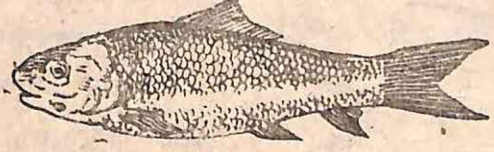
সরবরাহ করা হয়। কেহ কেহ নিজেদের বাড়িতে হাঁস, মুরগী পালন করে। হরিণঘাটা, টালিগঞ্জ, মেদিনীপুর, জলপাইগুড়িতে 'পোলট্রি ফার্ম' (মুরগী পালনকেন্দ্র) আছে। হাঁস ও মুরগীর ডিম বাজারে প্রচুর বিক্রয় হয়।

দ্বিতীয় পাঠ

মৎস্য

মাছ বাঙ্গালীদের প্রিয় খাদ্য। ইহা পুষ্টিকর ও উপাদেয়। পশ্চিমবঙ্গের নদী, খাল, বিল, ভেড়ি, অধিকাংশ দীঘি ও পুকুরে এবং সমুদ্রের উপকূলের নিকট মাছ পাওয়া যায়।

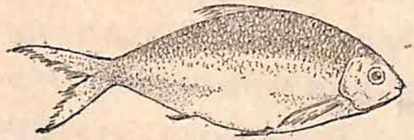
যে-জল হইতে মাছ ধরা হয় তাহার প্রকৃতি অনুসারে মাছকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়ঃ নদী, খাল, বিল, পুকুর প্রভৃতির **স্বাদু** জলের মাছ এবং সাগরের **লোনা** জলের মাছ। রুই, কাতলা, মৃগেল, ইলিশ, পাবদা, ট্যাংরা, কই, মাগুর, পুঁটি, বাটা, প্রভৃতি মৎস্য নদী,



কাতলা মাছ

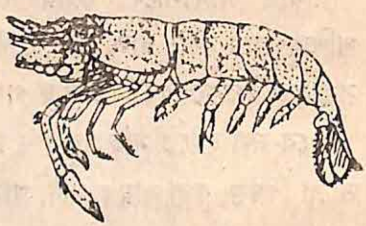
খাল, বিল, দীঘি, পুকুরের স্বাদু জলে পাওয়া যায়। ভেটকি, ভোলা, চিংড়ি, পমফ্রেট, প্রভৃতি লোনা জলের মাছ। জেলেরা ছোট বড় নানা-রকম জালের সাহায্যে নানাকায়দায় এই সব মাছ ধরে। ছোট ছোট

ডিঙ্গিতে চড়িয়া তাহারা দলে দলে মাঝনদীতে, এমন কি বড় নৌকায় ও আড়তদারের মোটর লঞ্চে চড়িয়া সাগরের দিকেও মাছ ধরিতে চলিয়া যায়। অবসর সময়ে তাহারা ঘরে বসিয়া নানারকমের জাল বোনে।

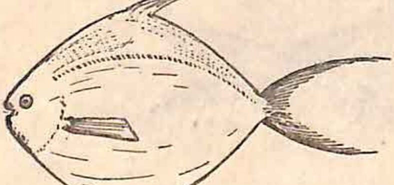


ইলিশ মাছ

সমুদ্রতীরের নিকট অগভীর জলে নানারকম মাছ পাওয়া যায়। অগভীর জলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলজ উদ্ভিদ্ ও জলকীট এই সব মাছের খাদ্য। এখানেই ইহারা ডিম পাড়ে। সুন্দরবনের ব-দ্বীপ অঞ্চলের খাঁড়িতে ইলিশ, ভেটকি, তপসে, গুর্জালি, চিংড়ি প্রভৃতি মৎস্য ধরিবার উপযুক্ত স্থান আছে। আজকাল মাছের ভেড়িতে (জলাশয়ে) নানারকম মাছের চাষ করা হয়।



চিংড়ি মাছ



পমফ্রেট মাছ

বঙ্গ বিভাগের পর হইতেই পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষতঃ কলিকাতায় মাছের অভাব দেখা যাইতেছে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে মাছের চাহিদা ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছে। প্রয়োজনের তুলনায় মাছের উৎপাদন কম বলিয়া অন্যান্য রাজ্য হইতে মাছ আমদানি করিতে হইতেছে। পশ্চিমবঙ্গের নদীগুলিতে, এমন কি বড় নদীগুলিতেও

বারোমাস সমান জল থাকে না। অনেক স্থানে ছোট ছোট নদী, খাল, বিল, দীঘি ও পুকুর মজিয়া যায় বলিয়া মাছের চাষের সুবিধা হয় না। মাছের চাষ বাড়াইতে হইলে দীঘি, পুকুর ইত্যাদি সংস্কারের বিশেষ প্রয়োজন।

সরকার কিছুকাল গভীর সমুদ্রে জাপানী 'ট্রলার' বা মাছ-ধরা জাহাজ দ্বারা মাছ ধরাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু মাছ ধরিবার যন্ত্রাদির অভাব এবং ধীবরদের উপযুক্ত শিক্ষার অভাব হেতু সমুদ্রে মাছ ধরিবার এই উদ্যোগটি সফল হয় নাই। সরকার জেলেদের অল্পমূল্যে জালের সুতা ও নৌকা দিয়া সাহায্য করিতেছেন। ইহা ছাড়া, বাংলাদেশ হইতে ইলিশ মাছ আমদানি করিয়া রাজ্যে মাছের ঘাটতি কিছুটা পূরণ করিবার চেষ্টা হইতেছে।

মেদিনীপুর জেলার জুনপুট, দীঘা, হলদিয়া, ২৪ পরগনা জেলার ডায়মণ্ড-হার্বার, কুলপি, নামখানা, ক্যানিং, কাকদ্বীপ, ফ্রেজারগঞ্জ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য মৎস্য শিকার কেন্দ্র। লালগোলা, কোলাঘাট, ডায়মণ্ড-হার্বার, ক্যানিং, হাসনাবাদ প্রভৃতি মৎস্য ব্যবসায়ের বড় কেন্দ্র। সমুদ্র হইতে প্রচুর মাছ ধরিয়া কলিকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য শিল্পাঞ্চলের বাজারে মাছের চাহিদা মিটাইবার চেষ্টা চলিতেছে।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রথম পাঠ

খনিজ দ্রব্য

পশ্চিমবঙ্গের প্রধান খনিজ সম্পদ **কয়লা**। বর্ধমান জেলার রাণীগঞ্জ ও আসানসোল অঞ্চলের খনি হইতে প্রচুর উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লা পাওয়া যায়। দার্জিলিং-এর পার্বত অঞ্চলে নিকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লা পাওয়া যায়। এই কয়লা পোড়াইয়া বিদ্যুৎ-উৎপাদন করা হয়। দার্জিলিং-এ **সোপস্টোন** (ট্যাল্‌ক্), **কেওলিন** কিছু পাওয়া যায়। সোপস্টোন দ্বারা কাপড় কাচা সাবান তৈয়ারি হয়। কেওলিন হইতে চীনামাটির জিনিস তৈয়ারি হয়। দার্জিলিং ও জলপাইগুড়িতে তামা এবং জলপাইগুড়ি ও পুরুলিয়াতে **ডলোমাইট** পাওয়া যায়। ডলোমাইট দ্বারা চুন তৈয়ারি হয়।

কয়লা কল-কারখানায়, রেল-ইঞ্জিন, স্টীমার, জাহাজ প্রভৃতি চালাইবার জন্য এবং গ্যাস ও বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গৃহস্থের দৈনন্দিন রান্নার কাজেও কয়লা নিত্য ব্যবহৃত হয়। ইহা আমাদের একটি অতি প্রয়োজনীয় খনিজ দ্রব্য। কয়লা হইতে গ্যাস উৎপন্ন হয় এবং আলকাতরা, ন্যাপথেলিন, স্যাকারিন, রং ও অন্যান্য **উপজাত দ্রব্যাদি** পাওয়া যায়।

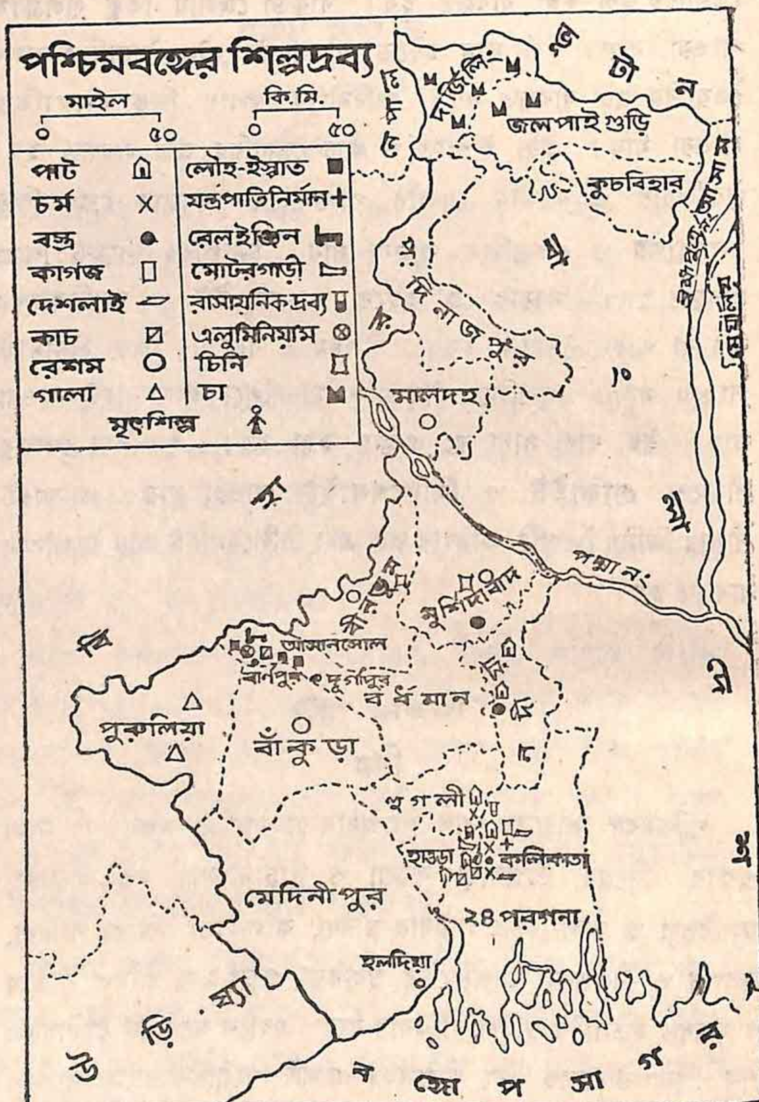
বর্ধমান জেলার বরাকরে সামান্য আকরিক **লৌহ** পাওয়া যায়। উহাতে ধাতব লৌহের পরিমাণ কম। বর্ধমান, বীরভূম ও বাঁকুড়া জেলায় লৌহ মিশ্রিত মাটি ও **কোয়ার্টজ** দেখা যায়। বালুকার মধ্যে কোয়ার্টজ বেশী পরিমাণে থাকে। কাচ, রং, সাবান প্রভৃতি

তৈয়ারির জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়। বাঁকুড়া জেলায় কিছু **উলফ্রাম** পাওয়া যায়। উলফ্রাম হইতে পাওয়া টাংস্টেন বৈদ্যুতিক বাল্‌ব তৈয়ারির জন্য ব্যবহৃত হয়। মেদিনীপুর জেলায় কিছু **ম্যাঙ্গানিজ** পাওয়া যায়। ইহা ইস্পাত ও কাচ তৈয়ারির জন্য ব্যবহৃত হয়। পুরুলিয়ায় ও বর্ধমান জেলার পশ্চিমাংশে **'ফায়ার ক্লে'**, কিছু **চুনাপাথর ও কেওলিন** পাওয়া যায়। চুনাপাথর সিমেন্ট শিল্পে ব্যবহৃত হয়। 'ফায়ার ক্লে' হইতে তাপসহ ইট ও জলনিকাশের নল বা পাইপ তৈয়ারি হয়। বীরভূম ও বাঁকুড়ায় কিছু চীনামাটি পাওয়া যায়। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরে ইলমেনাইট পাওয়া যায়। ইহা দ্বারা সাদা রং প্রস্তুত করা হয়। পুরুলিয়া জেলার সীমান্তে **গ্রাফাইট ও সিলিমেনাইট** পাওয়া যায়। গ্রাফাইট সীসার জিনিস তৈয়ারি করিবার জন্য এবং সিলিমেনাইট কাচ উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়।

দ্বিতীয় পাঠ

শিল্প

পশ্চিমবঙ্গ ভারতের শ্রেষ্ঠ শিল্পপ্রধান রাজ্যগুলির অন্যতম। নানা প্রকার শিল্পের উপযোগী কয়লা ও কাঁচামালের সহজ-লভ্যতা, জলবিদ্যুৎ ও তাপ-বিদ্যুৎ পাইবার সুবিধা, কলিকাতা বন্দরের সান্নিধ্য, জলপথ ও রেলপথে যাতায়াতের সুব্যবস্থা, প্রচুর জল, শ্রমিক, বাজার ও মূলধন ইত্যাদির সুবিধা থাকিবার ফলে এখানে কয়েকটি বৃহদায়তন শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে এবং পশ্চিমবঙ্গ একটি শিল্পোন্নত রাজ্যে পরিণত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের শিল্প কারখানাগুলি বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে


পশ্চিমবঙ্গের শিল্পদ্রব্য
মাইল
০ ৫০
কি.মি.
০ ৫০
পাট
চর্ম
বস্ত্র
কাগজ
দেশলাই
কাচ
রেশম
গালা
লৌহ-ইস্পাত
যন্ত্রপাতিনির্মাণ
রেলইঞ্জিন
মোটরগাড়ী
রাসায়নিকদ্রব্য
এলুমিনিয়াম
চিনি
চা
মৃৎশিল্প
দার্জিলিং
জলপাইগুড়ি
কুচবিহার
মালদহ
পদ্মা নং
মুর্শিদাবাদ
আসানসোল
বার্ণপুর
দুর্গাপুর
বর্ধমান
পুরুলিয়া
বাঁকুড়া
হুগলী
হাওড়া
কলিকাতা
মেদিনীপুর
২৪ পরগনা
হলদিয়া
ব ঙ্গো প সা গ র

কেন্দ্রীভূত হওয়ায় এই রাজ্যকে প্রধানত **চারিটি শিল্পাঞ্চলে** বিভক্ত করা যায়। যথা—(১) কলিকাতা বা হুগলী নদীতীরের শিল্পাঞ্চল। কলিকাতা ও উহার নিকটবর্তী ২৪ পরগনা, হুগলী ও হাওড়া জেলার শহরাঞ্চল লইয়া এই শিল্পাঞ্চল গঠিত। (২) আসানসোল-রাণীগঞ্জ শিল্পাঞ্চল। (৩) দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল এবং (৪) দার্জিলিং-জলপাইগুড়ি বা উত্তরবঙ্গের শিল্পাঞ্চল।

এই রাজ্যে **বৃহদায়তন যন্ত্রশিল্প** এবং **কুটীর শিল্প** দুই-ই আছে। এখানকার বৃহদায়তন শিল্পগুলির মধ্যে কলিকাতা অঞ্চলের **পাট শিল্প, কার্পাস বয়ন শিল্প, রাসায়নিক শিল্প, কাগজ শিল্প, মোটরগাড়ি নির্মাণ শিল্প,** আসানসোল-রাণীগঞ্জ অঞ্চলের **লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, রেল-ইঞ্জিন নির্মাণ শিল্প,** দুর্গাপুর অঞ্চলের লৌহ ও ইস্পাত শিল্প এবং উত্তরবঙ্গের **চা-শিল্প** বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বৃহদায়তন যন্ত্রশিল্প

পাট শিল্প—হুগলী নদীর দুই তীরে পাট শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। বর্তমানে এই রাজ্যে ১০১ টি পাটকল আছে। বাঁশবেড়িয়া, নৈহাটী, কাঁকিনাড়া, আগরপাড়া, জগদ্দল, টিটাগড়, রিষড়া, শ্রীরামপুর, বালী, বরানগর, উলুবেড়িয়া, বজবজ, বিড়লাপুর প্রভৃতি স্থানে পাটের কল আছে। পৃথিবীর আর কোথাও এত পাটের কল নাই। ভারতের কাঁচা পাটের উৎপাদন স্থানীয় চাঁহিদার প্রায় সমান হইলেও, এখনও উৎকৃষ্ট মানের কাঁচাপাট বাংলাদেশ হইতে আমদানি করিতে হয়। রাণীগঞ্জের কয়লা, দামোদর পরিকল্পনার বিদ্যুৎ সরবরাহ ও কলিকাতা বন্দরের সহিত যোগাযোগ প্রভৃতি এই শিল্পের উন্নতির পক্ষে সহায়ক।

পাট হইতে যে কাপড় বোনা হয় তাহা প্রধানত দুই প্রকার—‘হেসিয়ান’ ও স্যাকিং। হেসিয়ান বা মোটা কাপড় হইতে চট, থলে,



হুগলী নদীর তীরবর্তী শিল্পাঞ্চল

ঢাকনার কাপড়, কার্পেট বস্ত্র ইত্যাদি তৈয়ারি হয়। স্যাকিং হইতে যে সমস্ত থলে, বস্তা ইত্যাদি প্রস্তুত হয় তাহা অপেক্ষাকৃত উন্নত ধরনের এবং আমরা দৈনন্দিন নানা কাজে তাহা ব্যবহার করি। পাট হইতে ক্যানভাস, ব্যাগ, ত্রিপল, কার্পেট, দড়ি, পা-পোষ ইত্যাদি নানারকম প্রয়োজনীয় সামগ্রী কারখানায় তৈয়ারি হয়। পাটের ন্যায় **'মেস্তা'** নামক একপ্রকার তন্তুময় উদ্ভিদের চাষ করিয়া পাটের সঙ্গে মিশাইয়া এই রাজ্যের পাটের অভাব খানিকটা পূরণ করা হইতেছে।

কার্পাস-বয়ন শিল্প

পশ্চিমবঙ্গে তূলা খুব সামান্যই উৎপন্ন হয়। তৎসত্ত্বেও এই রাজ্য কার্পাসবস্ত্র উৎপাদনে তৃতীয় স্থান অধিকার করে। এখানে ৪০টির অধিক বড় কাপড়ের কল আছে। শ্রীরামপুর, হাওড়া, রিষড়া, কোন্নগর, বেলঘরিয়া, সোদপুর, পানিহাটী, শ্যামনগর, সালকিয়া, উলুবেড়িয়া প্রভৃতি স্থানে কাপড়ের কলগুলি অবস্থিত। রাণীগঞ্জের কয়লা, পশ্চিমবঙ্গের আর্দ্র জলবায়ু, কলিকাতা বন্দরের সান্নিধ্য, যাতায়াতের সুব্যবস্থা ইত্যাদি কারণে এই বস্ত্র শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। কার্পাস বয়নশিল্পকে কেন্দ্র করিয়া হোসিয়ারী শিল্পও উন্নতি লাভ করিয়াছে। এই অঞ্চলে গেঞ্জি, মোজা, তোয়ালে তৈয়ারি করিবার বড় কারখানা আছে।

রাসায়নিক শিল্প—এই রাজ্যে সালফিউরিক এসিড, সোডা-অ্যাশ, কস্টিক সোডা, ব্লীচিং পাউডার, ন্যাপথেলিন, ফিনাইল, ক্লোরিন, নানাপ্রকার রং, বেনজিন প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক দ্রব্যের এবং প্রসাধন সামগ্রী ও ঔষধের অনেক কারখানা আছে। হুগলী জেলায় রিষড়া নামক স্থানে অ্যালক্যালি কেমিক্যাল করপোরেশনের এক বৃহদায়তন রাসায়নিক শিল্পের কারখানা আছে।

কলিকাতার উপকণ্ঠে পানিহাটীতে ও মানিকতলায় বেঙ্গল কেমিক্যালের রাসায়নিক দ্রব্য ও ঔষধের কারখানা, বরানগরে বেঙ্গল ইমিউনিটি এবং বালীগঞ্জ অঞ্চলে দে'জ মেডিক্যাল স্টোরের ঔষধের কারখানা আছে। বার্নপুরের কারখানায় বেন্‌জিন, রাসায়নিক সার প্রভৃতি উৎপন্ন হয়।

কাগজ শিল্প—কাগজ উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গ শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে। এই রাজ্যের কাগজের কলগুলি নৈহাটী, কাঁকিনাড়া, টিটাগড়, আলমবাজার, বালী, শ্রীরামপুর, ত্রিবেণী ও রাণীগঞ্জে অবস্থিত। সাবাই ঘাস অথবা বাঁশ, ছেঁড়া কাপড় ও কাঠের মণ্ড ইত্যাদি কাগজ শিল্পের প্রধান কাঁচা মাল।

মোটরগাড়ি নির্মাণ শিল্প—কলিকাতার নিকটে হুগলী জেলার উত্তরপাড়া সংলগ্ন 'হিন্দ্‌ মোটর'-নামক স্থানে 'হিন্দুস্থান মোটর্‌স্‌'-নামক ভারতের বৃহত্তম মোটরগাড়ি নির্মাণের কারখানাটি অবস্থিত।

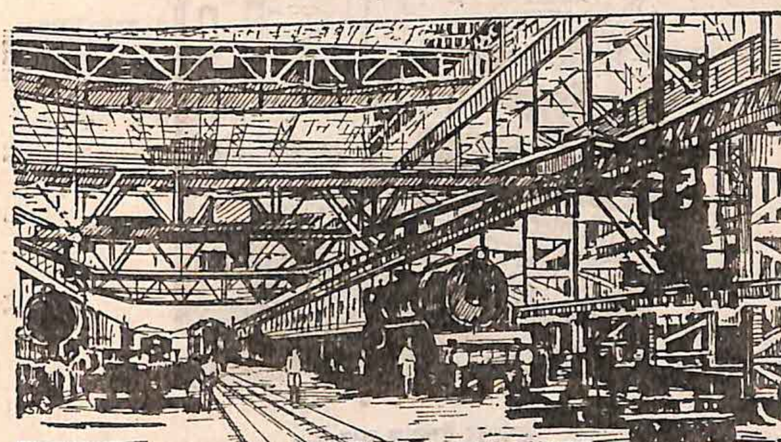
লৌহ ও ইস্পাত শিল্প

রাণীগঞ্জ ও আসানসোল অঞ্চলের কয়লা খনিগুলিকে কেন্দ্র করিয়া এই রাজ্যে বর্ধমান জেলার কুলটী, বার্নপুর, হীরাপুর ও দুর্গাপুরে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। সংলগ্ন অঞ্চল হইতে কয়লা এবং নিকটবর্তী বিহার ও উড়িষ্যা রাজ্য হইতে লৌহ, চুনাপাথর, ম্যাঙ্গানিজ ও অন্যান্য খনিজ পদার্থ আনিয়া এই শিল্পে ব্যবহার করা হয়। ইহা ছাড়া, দামোদরের জল, জলবিদ্যুৎ ও তাপবিদ্যুৎ, স্বাস্থ্যবান সাঁওতাল শ্রমিক, সুদক্ষ ইঞ্জিনিয়ারদের সাহায্য, কলিকাতা বন্দরের সহিত যোগাযোগ এবং যাতায়াত ব্যবস্থার সুবন্দোবস্ত থাকায় এই শিল্প ক্রমশ প্রসার লাভ করিতেছে। বার্নপুরে লোহা গলাইয়া কড়ি, বরগা,

রেললাইন প্রভৃতি লোহার জিনিস তৈয়ারি হইতেছে। কুলটী, বার্নপুর ও হীরাপুর এই তিনটি স্থানের ইস্পাত প্রকল্পের মিলিত নাম "ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড স্টীল কোম্পানী।"

রেল-ইঞ্জিন নির্মাণ শিল্প

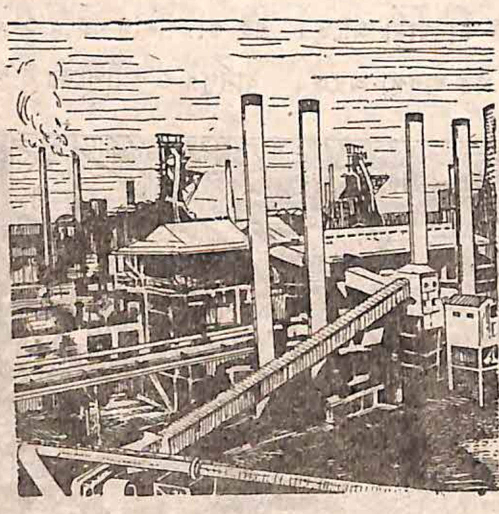
বর্ধমান জেলার আসানসোলের নিকট চিত্তরঞ্জনে একটি রেল-ইঞ্জিন নির্মাণের বিরাট কারখানা আছে। এই কারখানায় বছরে ৩০০টি ইঞ্জিন তৈয়ারি করার মত ব্যবস্থা আছে। বার্নপুর ও দুর্গাপুরের ইস্পাত এবং



চিত্তরঞ্জন রেল-ইঞ্জিন নির্মাণ কারখানা

রাণীগঞ্জের কয়লা সহজলভ্য হওয়ায় এই কারখানার পক্ষে খুবই সুবিধা হইয়াছে। মেদিনীপুর জেলায় খড়্গপুরে রেলগাড়ি ও ইঞ্জিন মেরামতের কারখানা আছে। হাওড়া জেলার লিলুয়াতে এবং ২৪ পরগনা জেলার কাঁচড়াপাড়ায় রেলের প্রয়োজনীয় নানাবিধ অংশ তৈয়ারি ও মেরামত করা হয়।

দুর্গাপুরে ব্রিটিশ ও ভারত সরকারের সহযোগিতায় একটি বিরাট **লৌহ ও ইস্পাত শিল্পকেন্দ্র** গড়িয়া উঠিয়াছে। এখানে নানারকম যন্ত্রপাতি প্রস্তুত হয়। কয়লাখনি অঞ্চলগুলি নিকটবর্তী হওয়ায় এবং রেলপথ ও রাজপথ দ্বারা কলিকাতা বন্দরের সহিত যুক্ত থাকায় ভবিষ্যতে ইহার বৃহৎ শিল্পকেন্দ্রে পরিণত হইবার সম্ভাবনা আছে।



দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা

দুর্গাপুরে একটি **তাপ-বিদ্যুৎ** উৎপাদন কেন্দ্র ও **কোক** (পোড়া কয়লা) তৈয়ারির চুল্লী আছে। কোক কয়লার ধোঁয়া হইতে **গ্যাস** উৎপাদন করা হয় এবং সেই গ্যাস পাইপ যোগে শহর এবং শিল্পাঞ্চল-গুলিতে সরবরাহ করা হয়।

কোক কয়লা ইস্পাত কারখানায় লৌহ গলাইবার ও সাধারণ রান্নার কাজে ব্যবহৃত হয়।

দুর্গাপুরে একটি **লেন্স** তৈয়ারির কারখানা এবং একটি **সার** উৎপাদনের কারখানা আছে।

ইহা ছাড়া, লৌহ দ্রব্য ও ইস্পাত নির্মিত দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিবার ছোট ছোট ২৮ টি কারখানা এই রাজ্যে অবস্থিত। সম্প্রতি পুরুলিয়ায় একটি ছোট ইস্পাত কারখানা স্থাপন করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে।

ব্যাণ্ডেল ও সান্তালদিহিতে **তাপবিদ্যুৎ** উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে।

চা-শিল্প

চা উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গের স্থান দ্বিতীয় হইলেও চা-শিল্পে এই রাজ্যের স্থান সর্বোপরি। দার্জিলিং জেলায় ১৩০টি এবং জলপাইগুড়ি



চা-এর একটি কুঁড়ি ও দুইটি পাতা তোলা হয়।

জেলায় ১৫৫টি চা-বাগান এবং তৎসংলগ্ন চা-এর কারখানা আছে। চা-শিল্পে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে ২ লক্ষেরও অধিক লোক নিযুক্ত আছে। চায়ের পাতা ও কুঁড়িগুলি কারখানায় নানাবিধ প্রক্রিয়ায় শুখাইয়া লইবার পর যে চা প্রস্তুত হয় তাহাকে কাল চা বলে। সাধারণত

গুঁড়া ও পাতা চা বাজারে বেশী চলে। দার্জিলিং-এর চা স্বাদে ও গন্ধে সর্বোৎকৃষ্ট এবং বাজারে বেশী দামে বিক্রয় হয় ও বিদেশে প্রচুর রপ্তানি হয়। পশ্চিমবঙ্গ চা রপ্তানি করিয়া প্রায় ৫০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। কুচবিহারেও কিছু চা উৎপন্ন হয়।

চা-শিল্পকে কেন্দ্র করিয়া প্লাই-উড ও চা-এর বাক্স তৈয়ারি করিবার কিছুসংখ্যক কাঠের কারখানাও এই অঞ্চলে গড়িয়া উঠিয়াছে। এই অঞ্চল রেলপথে কলিকাতা ও আসামের সহিত সংযুক্ত।

অন্যান্য শিল্প

ইক্ষু-শিল্প

ইক্ষু শিল্পে এই রাজ্য এখনও অনুন্নত। পশ্চিমবঙ্গে ৩টি চিনির কল আছে। মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙ্গায়, নদীয়া জেলার পলাশীতে এবং বীরভূম জেলার আহমদপুরে এই কলগুলি অবস্থিত। পশ্চিমবঙ্গে চিনির চাহিদা প্রায় ১ লক্ষ মেঃ টন। কিন্তু এখানকার কলগুলিতে চাহিদার তুলনায় উৎপাদন অনেক কম। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার ইক্ষুর চাষ বৃদ্ধি করিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন।

অ্যালুমিনিয়ম শিল্প—ভারতে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ অ্যালুমিনিয়ম তৈয়ারির কারখানা আসানসোলে অনুপনগরে অবস্থিত। ইহা ভিন্ন বেলুড়েও একটি অ্যালুমিনিয়ম কারখানা আছে।

খিদিরপুরে নেতাজী সুভাষ ডকে (পূর্বনাম কিং জর্জ ডক্) একটি জাহাজ মেরামতের কারখানা আছে।

কলিকাতার নানা অঞ্চলে এবং হাওড়া জেলায় বহু ছোট ছোট লৌহ কারখানা আছে। এই সমস্ত কারখানায় নানারকম যন্ত্রপাতি তৈয়ারি হয়।

বজবজের নিকট বাটানগরে **জুতা নির্মাণের** বিরাট কারখানা আছে। পশ্চিমবঙ্গে ইহা ছাড়াও স্যুটকেশ, ব্যাগ ইত্যাদি চর্মনির্মিত দ্রব্যাদি প্রস্তুত, সংস্কার ও রং করিবার এবং মৃত জন্তুর অস্থি চূর্ণ করিবার কয়েকটি কারখানা আছে।

পলতায় 'বেঙ্গল এনামেল' নামক একটি এনামেলের বাসন পত্র, ট্রে, টর্চ প্রভৃতি তৈয়ারি করিবার বড় কারখানা আছে।

হুগলী জেলার বাঁশবেড়িয়ায় সাহাপুরে ডানলপ কোম্পানীর বিরাট **রবারের** কারখানা অবস্থিত। এখানে মোটরগাড়ি ও লরীর টায়ার তৈয়ারি হয়।

আসানসোলে সেন র‍্যালে কোম্পানীর একটি **সাইকেল** তৈয়ারি করিবার কারখানা ও কাপড়ের কল এবং রূপনারায়ণপুরে **বৈদ্যুতিক তার** তৈয়ারি করিবার কারখানা আছে। রাণীগঞ্জে ইট, টালি ও মাটির নল (পাইপ) ও কাগজ তৈয়ারি করিবার কারখানা আছে। রিষড়ায় একটি পলিথিন প্রস্তুত করিবার কারখানা আছে।

কলিকাতা, হাওড়া ও ব্যাণ্ডেলের নিকটে রবারের টায়ার, টিউব, ওয়াটার প্রুফ (বর্ষাতি), ফুটবলের ব্লাডার ও খেলনা ইত্যাদি তৈয়ারি করিবার কারখানা আছে।

দক্ষিণেশ্বরে উইমকো-নামক একটি **দিয়াশলাই** তৈয়ারির কারখানা আছে। কাশীপুরে সরকারী বন্দুক ও গোলা তৈয়ারি করিবার কারখানা এবং ইছাপুরে বন্দুক নির্মাণের কারখানা আছে।

মেদিনীপুরের সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলে সমুদ্রের লোনা জল হইতে লবণ তৈয়ারি হয়। সরকারী উদ্যোগে হলদী নদীর তীরে অবস্থিত নবনির্মিত **হলদিয়া** বন্দরে একটি খনিজ **তৈল শোধনাগার** স্থাপনের চেষ্টা হইতেছে। এখানে **সার** কারখানা তৈয়ারির কাজ আরম্ভ

হইয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে হলদিয়ায় একটি সুপরিকল্পিত নগর গড়িয়া উঠিবার সম্ভাবনা আছে।

ক্ষুদ্রায়তন বা **কুটীর শিল্প**—এই রাজ্যের কুটীর শিল্পের মধ্যে **রেশম শিল্প** ও **তাঁত শিল্পই** প্রধান। মালদহ, মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর ও বীরভূম প্রভৃতি স্থানে উৎকৃষ্ট রেশম বস্ত্রাদি প্রস্তুত হয়। ধনেখালি, ফরাসডাঙা, বেগমপুর, শান্তিপুর, বিষ্ণুপুর, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি স্থান তাঁত বস্ত্রের জন্য প্রসিদ্ধ।

পুরুলিয়া জেলার ঝালদায় **গালা** তৈয়ারির কারখানা আছে। এই জেলায় একটি বার্নিশ তৈয়ারির শিল্পকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে।

কৃষ্ণনগরের **মাটির পুতুল**, মেদিনীপুরের মাদুর, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ ও বর্ধমান জেলার দাঁইহাটের **কাঁসা ও পিতলের** বাসন এবং মুর্শিদাবাদের **হাতির দাঁতের** জিনিস, বিষ্ণুপুরের **শাঁখের** জিনিস-পত্র এবং বর্ধমান জেলার কাঞ্চননগরের **ছুরি, কাঁচি**, কোদাল প্রভৃতি বিখ্যাত।

পশ্চিবঙ্গের গ্রামাঞ্চলের নানা রকমের কুটীর শিল্পের মধ্যে কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ২৪ পরগনা, মেদিনীপুর ও হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়ায় নারিকেলের ছোবড়ার দড়ির কারখানা আছে। ইহা ছাড়া, তেলের ঘানি, গুড়, বিড়ি, দড়ি, শতরঞ্জি, কাঠের আসবাবপত্র, সোনা-রূপার গহনা, কাঠ ও মাটির তৈয়ারি খেলনা, হাতে তৈয়ারি কাগজ প্রভৃতি তৈয়ারি করিবার কুটীর শিল্পও আছে। শ্রীনিকেতনের বেতের সুন্দর সুন্দর মোড়া এবং নানাস্থানে তৈয়ারি বাক্স, ঝুড়ি, হাতপাখা, ব্যাগ, কুলো, ডালা, সাজি, চালুনা প্রভৃতি নানারকম জিনিস আমাদের নিত্যপ্রয়োজনে লাগে।

কলিকাতার শহরতলিতে টালিগঞ্জ অঞ্চলে কয়েকটি চলচ্চিত্র নির্মাণের স্টুডিও আছে।

ত্রিপুরা

সূচনা

আসামের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত ত্রিপুরা একটি প্রাচীন ও ক্ষুদ্র পার্বত রাজ্য। ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দে ইহা স্বাধীন ভারতে যোগদান করে। ১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই অক্টোবর ইহার ভারতভুক্তি আনুষ্ঠানিক ভাবে সম্পন্ন হয়। ঐ দিন হইতে ত্রিপুরা ভারত সরকারের শাসনাধীনে আসে। ১৯৭২ খ্রীস্টাব্দের ২১শে জানুয়ারী কেন্দ্র-শাসিত ত্রিপুরাকে আনুষ্ঠানিক ভাবে রাজ্যপাল-শাসিত পূর্ণাঙ্গ রাজ্যরূপে ঘোষণা করা হয়। শাসনকার্যের সুবিধার জন্য ত্রিপুরাকে তিনটি জেলায় এবং এই জেলাগুলিকে দশটি মহকুমায় বিভক্ত করা হইয়াছে। যথা—

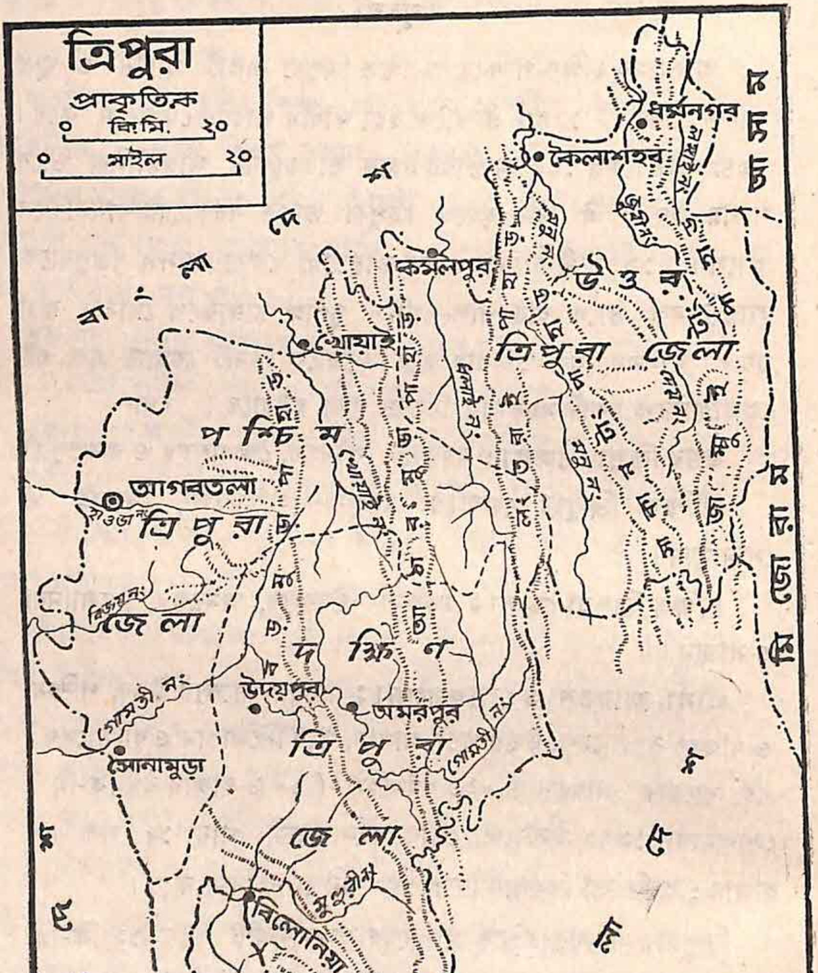
উত্তর ত্রিপুরা জেলা : মহকুমা— ধর্মনগর, কৈলাশহর ও কমলপুর।

পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা : মহকুমা—আগরতলা, খোয়াই ও সোনামুড়া।

দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা : মহকুমা—উদয়পুর, অমরপুর, বিলোনিয়া ও সাব্রুম।

সীমা, আয়তন ও লোকসংখ্যা : ত্রিপুরা রাজ্যের উত্তর, পশ্চিম, ও দক্ষিণে বাংলাদেশ, উত্তর-পূর্বে আসাম, পূর্বে মিজোরাম ও বাংলাদেশ। এই রাজ্যের আয়তন ৪,০৩৬ বর্গমাইল -(১০˙৬ হাজার বর্গ কি-মি.) লোকসংখ্যা ১৯৭১ খ্রীস্টাব্দের লোক গণনানুযায়ী প্রায় ১৫ লক্ষ ৫৭ হাজার ; প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ১৪৯ জন লোক বাস করে।

ত্রিপুরার ধর্মনগর হইতে আসামের কলকলিঘাট পর্যন্ত ১২ কি-মি. রেলপথ আছে। ত্রিপুরার সর্বপ্রধান রাজপথ 'আসাম-আগরতলা রোড' আগরতলা হইতে আসামের করিমগঞ্জ পর্যন্ত গিয়াছে। ইহা ভিন্ন আগরতলা হইতে অন্যান্য মহকুমা শহরে মোটর-বাসে যাতায়াতের রাস্তা আছে। ত্রিপুরার রাজধানী **আগরতলায়** বিমান বন্দর আছে।


ত্রিপুরা
প্রাকৃতিক
কি.মি.
মাইল
ধর্মনগর
কৈলাশহর
কমলপুর
খোয়াই
আগরতলা
উদয়পুর
অমরপুর
সোনামুড়া
বিলোনিয়া
সাব্রুম
উত্তর ত্রিপুরা জেলা
পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা
দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা
গোমতী নং
ফেনী নং
বাংলাদেশ
আসাম
মিজোরাম

প্রথম অধ্যায়

প্রথম পাঠ

ভূ-প্রকৃতি

প্রাকৃতিক গঠন অনুসারে ত্রিপুরাকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা—পাহাড় অঞ্চল (শতকরা ৬০ ভাগ) ও সমভূমি অঞ্চল (শতকরা ৪০ ভাগ)। এই রাজ্যে ছোট বড় অনেক পাহাড় ও টিলা আছে। ছোট ছোট পাহাড়কে **টিলা** বলা হয়। **বড়মুড়া, আঠারমুড়া, লংতরাই, জাম্পুইটাং, সাকানটাং** প্রভৃতি বড় বড় পাহাড় সমান্তরালভাবে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত। দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী নিম্ন সমতলভূমিকে **উপত্যকা** বলে এবং ইহা গড়ে ১৯ কি-মি. বিস্তৃত। পাহাড়গুলি ১৫ মি. হইতে ৬১৫ মি. উচ্চ। দুই টিলার মধ্যবর্তী নিম্ন সমতলভূমির নাম **লুঙ্গা**। এই রাজ্যে অনেক লুঙ্গা আছে।



ডম্বুর জলপ্রপাত

লুঙ্গা ও উপত্যকাগুলিতেই প্রধানত চাষ-আবাদ হয়। এই রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিক ঢালু।

নদ-নদী ঃ গোমতী ত্রিপুরার প্রধান নদী। ইহা সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ নদী, লংতরাই পাহাড় হইতে উৎপন্ন হইয়া তীর্থমুখ, অমরপুর, উদয়পুর ও সোনামুড়ার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া বাংলাদেশে প্রবেশ করিয়াছে। তীর্থমুখের নিকটে এই নদী **ডম্বুর** জল-প্রপাত সৃষ্টি করিয়াছে। 'ডম্বুর পরিকল্পনা' অনুসারে গোমতী নদীতে বাঁধ দিয়া অদূর ভবিষ্যতে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হইবে। এতদ্ব্যতীত, **লঙ্গাই, জুরী, মনু, ধলাই, খোয়াই, মুহুরী, ফেণী, হাওড়া ও বিজয়** এখানকার উল্লেখযোগ্য নদী। এই নদীগুলির সামান্য অংশই নৌ-চলাচলের উপযোগী। বর্ষাকালেই নদীগুলি জলপূর্ণ থাকে এবং খরস্রোতা হয়, অন্যসময়ে নদীগুলি ক্ষীণস্রোতা থাকে।

জলবায়ু ঃ ত্রিপুরা রাজ্য মৌসুমী জলবায়ুর অন্তর্গত। সুতরাং জলবায়ু **উষ্ণ ও আর্দ্র**। শীত ও গ্রীষ্ম কোনটাই দীর্ঘস্থায়ী নয়। বর্ষাকালে এই রাজ্যে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত প্রায় ২০০ সেন্টিমিটার। কিন্তু সর্বত্র বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সমান নয়। সাব্রুম, বিলোনিয়া, কৈলাশহর ও ধর্মনগরে বেশী বৃষ্টিপাত হয়। মোটামুটি জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ ও স্বাস্থ্যকর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম পাঠ

ত্রিপুরার অধিবাসী

ত্রিপুরার অধিবাসীদিগের অধিকাংশই বাঙ্গালী হিন্দু। আদিবাসী ব্যতীত অল্পসংখ্যক মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান ও মণিপুরী এখানে বাস করে।

ঘরবাড়িঃ ত্রিপুরার বনজঙ্গলে প্রচুর বাঁশ, বেত, ছন পাওয়া যায়। সেজন্য অনেক বাসগৃহ ঐ সকল উপাদানের দ্বারা নির্মিত হয়। বাঁশ, বেত, ছনের দ্বারা তৈয়ারি **দোচালা, চারচালা, আটচালা** প্রভৃতি নানা ধরনের বাড়িঘর দেখা যায়। পাহাড় ও টিলার উপরে আদিবাসীদের মধ্যে কেহ কেহ **টঙঘরে** বাস করে। বাঁশের খুঁটির উপরে মাচা তৈয়ারি করা হয় এবং মাচার উপরে বাঁশের বেড়া ও ছনের ছাউনি দেওয়া কুঁড়ে-ঘর নির্মিত হয়। ঐ ঘরগুলিকে টঙ-ঘর বলে।



টঙ ঘর

খাদ্য ঃ ত্রিপুরার প্রধান খাদ্যশস্য **ধান**। সুতরাং ভাতই এখানকার অধিবাসীদিগের প্রধান খাদ্য। উপত্যকা ও লুঙ্গার সমভূমিতে আলু, নানারকমের শাকসবজি, ফল প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। লোকেরা বাঁধ দিয়া জল আটকাইয়া মাছের চাষ করে।

পুকুরে, নদীতেও মাছ পাওয়া যায়। তাই এখানকার অধিবাসীদিগের খাদ্য **ভাত, মাছ, ডাল, তরকারী।**

পোশাকঃ ত্রিপুরার অধিবাসিগণের মধ্যে বাঙ্গালীরা ধুতি, চাদর, জামা, প্যান্ট, কোট ইত্যাদি পরে, মেয়েরা শাড়ী, ব্লাউজ, সায়া ইত্যাদি পরে ও গায়ে সোনার অলঙ্কার ব্যবহার করে। আদিবাসী মেয়েরা অনেকে তাঁতে তৈয়ারি **পাছড়া, রিয়া** পরে ও গায়ে রূপার অলঙ্কার ব্যবহার করে।

জীবিকাঃ ত্রিপুরার অধিবাসিগণের বেশীর ভাগই **কৃষিজীবী।** উপত্যকা ও লুঙ্গার সমভূমিতে লাঙ্গলের সাহায্যে চাষ-আবাদ হয়। আদিবাসীদের মধ্যে অনেকে **জুম চাষ** করে। পাহাড় ও টিলাতে ধাপে ধাপে সমতল বা **'টেরেস'** তৈয়ারি করিয়াও চাষ-আবাদ হইতেছে। আদিবাসীরা জঙ্গল আগুনে পোড়াইয়া কিছু জমি বাহির করিয়া তথায় অনেকগুলি গর্ত খুঁড়িয়া রাখে। বর্ষাকালে ঐ সকল গর্তে ধান, ভুট্টা, তিল প্রভৃতির বীজ পুঁতিয়া মাটি চাপা দেয়। এইভাবে চাষ করিয়া তাহারা ফসল উৎপাদন করে। এই রকম চাষ-আবাদের নাম জুম চাষ।

দ্বিতীয় পাঠ

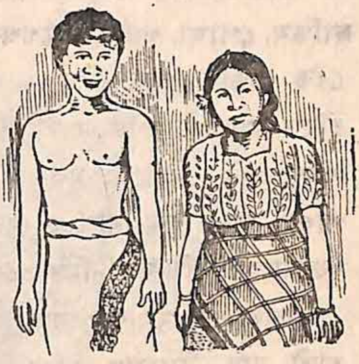
ত্রিপুরার আদিবাসী

ত্রিপুরার ১৫ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে আদিবাসীর সংখ্যা ৪ লক্ষ। আদিবাসীদের মধ্যে নানা শ্রেণীর উপজাতি আছে। তাহাদের মধ্যে **ত্রিপুরী, রিয়াং, লুসাই, গারো, চাক্‌মা, মগ, হালাম, জামাতিয়া, নোয়াতিয়া** প্রভৃতি প্রধান।

আদিবাসীদিগের মধ্যে অধিকাংশই **ত্রিপুরী**। ত্রিপুরীদের পোশাক-পরিচ্ছদ, বাড়িঘর, খাদ্য ইত্যাদি বাঙ্গালী হিন্দুদের ন্যায়।

রিয়াংদের আচার-ব্যবহার, খাদ্য, পোশাক, বাড়িঘর, জীবিকা ইত্যাদি ত্রিপুরীদের ন্যায়। তাহারা সাহসী, পরিশ্রমী ও শিকার-পটু। ত্রিপুরার মহারাজাদের সেনাপতি বেশীর ভাগ রিয়াং সম্প্রদায় হইতে নিযুক্ত হইত।

লুসাইরা বেশীর ভাগই খ্রীস্টান। মেয়েরা নক্‌সা করা শাড়ী, ব্লাউজ, সায়া ইত্যাদি ব্যবহার করে। লুসাইদের দেহের রং কিছু ফর্সা ও মুখ গোল। আজকাল অনেক লুসাই মেয়ে লেখাপড়া শিখিয়া চাকরি ও শিল্প কাজে নিযুক্ত আছে।



রিয়াং দম্পতি

চাক্‌মাদের ত্রিপুরার প্রায় সব অঞ্চলে দেখা যায়। তাহাদের রং হলদে, নাক চ্যাপ্টা এবং মুখ গোল। চাক্‌মারা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম পাঠ

উৎপন্ন দ্রব্য

বনজ সম্পদ: ত্রিপুরার পাহাড় অঞ্চলের বনভূমিতে **শাল, সেগুন, ছাতিম, গোমা, গর্জন, নাগেশ্বর, চাম্বল, গাম্ভারী, শিমুল, বাঁশ, ছন, বেত** প্রভৃতি প্রচুর জন্মে। বনভূমি হইতে জ্বালানি কাষ্ঠ ব্যতীত গৃহের আসবাবপত্র নির্মাণের মূল্যবান কাষ্ঠ পাওয়া যায়। ছন, বাঁশ ও বেত দ্বারা বহুলোকের বাড়ি-ঘর নির্মিত হইতেছে।



ধনেশ পাখী

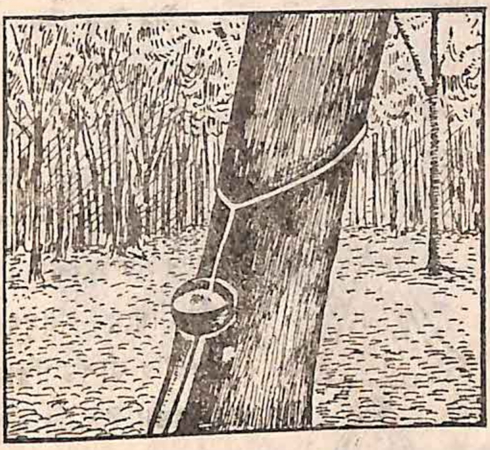
বনভূমিতে মূল্যবান বৃক্ষ ব্যতীত হাতী, বাঘ, চিতাবাঘ, হরিণ, ভল্লুক, বুনো মহিষ, বিষধর সর্প প্রভৃতি জীবজন্তু এবং **ধনেশ,** টিয়া, ভৃঙ্গরাজ প্রভৃতি নানারকম পাখী দেখা যায়। হরিণের চামড়া, শিং, হাতীর দাঁত এবং ধনেশ পাখীর ঠোঁট, চর্বি ও হাড় মূল্যবান।

দ্বিতীয় পাঠ

কৃষিজ সম্পদ

ত্রিপুরা কৃষিপ্রধান রাজ্য। এখানে **ধান, পাট, আখ, তিল** ও **সরিষা** প্রচুর জন্মে। ইহা ছাড়া, **আলু, কফি, শিম** প্রভৃতি নানারকম সবজিও উৎপন্ন হয়। আজকাল **গমের** চাষও শুরু হইয়াছে।

পাহাড় এবং টিলার ঢালে **চা**-এর চাষ হয়। কিছু **কফির** চাষও হয়। টিলায় পাট ও **মেস্তার** চাষও হয়। এই রাজ্যে অনেক চা-বাগান আছে। আদিবাসী পুরুষ ও মেয়েরা এইসব চা-বাগানে কাজ করে। এই রাজ্যের প্রায় সর্বত্র **আনারস, লিচু, কমলালেবু, আম, কাঁঠাল, কলা** ইত্যাদি নানারকম ফল উৎপন্ন হয়। ইহা ব্যতীত এখানে **তুঁত** গাছের চাষও হইতেছে।



রবারের নির্যাস সংগ্রহ

ত্রিপুরায় **রবার** চাষের উজ্জ্বল সম্ভাবনা আছে। ত্রিপুরার উত্তরাঞ্চলে কৈলাশহরে এবং দক্ষিণাঞ্চলে সাব্রুম, বিলোনিয়া, উদয়পুর ও সদর মহকুমায় রবারের চাষ বৃদ্ধি পাইতেছে। এখানে নলকূপের সাহায্যে জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা আছে।

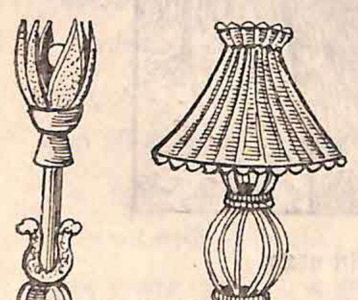
খনিজ সম্পদ ঃ ভবিষ্যতে **বড়মুড়া** পাহাড়ে খনিজ তৈল পাইবার সম্ভাবনা আছে। তাহা ছাড়া এই ক্ষুদ্র রাজ্যে কোন খনিজ সম্পদ নাই।

তৃতীয় পাঠ

শিল্পজাত দ্রব্য

বিদ্যুৎ-শক্তির অভাবে এবং যাতায়াতের সুব্যবস্থা না থাকায় ত্রিপুরা রাজ্যে লৌহ ও ইস্পাত বা এই ধরনের কোন বৃহৎ-শিল্প এখনও গড়িয়া উঠিতে পারে নাই।

চা-শিল্প বর্তমানে এই রাজ্যের প্রধান শিল্প। এখানে ছোট-বড় ৫৫টি চা-বাগান আছে। ত্রিপুরার **কুটীর শিল্প** বিখ্যাত। বাঁশ ও বেতের সাহায্যে আদিবাসীরা নানারকম প্রয়োজনীয় ও সৌখীন দ্রব্য নির্মাণ করে। ত্রিপুরার **তাঁতের কাপড়** বিখ্যাত। ত্রিপুরী ও মণিপুরীরা নিজেদের তাঁতে কাপড় বুনিয়া থাকে। রঙ-বেরঙের নক্সা করা মণিপুরী গায়ের চাদর ও বিছানার চাদর খুব চমৎকার। আদিবাসীরা তাঁত-শিল্পে নিপুণ। তাহাদের তৈয়ারি কাপড় **'রিয়া', 'পাছড়া', 'ডুবড়া'** ইত্যাদি খুবই সুন্দর।



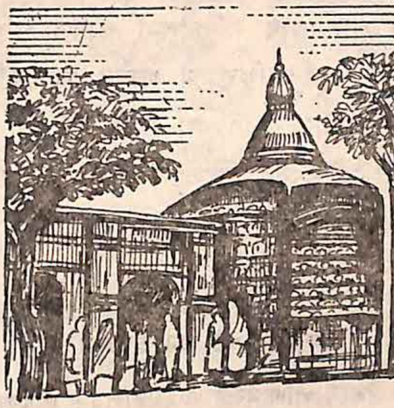
কাঠের সৌখিন জিনিস

অন্যান্য **কুটীর শিল্প দ্রব্যের** মধ্যে ছাতার বাঁট, বাঁশ ও বেতের মোড়া, আর্ম-চেয়ার, সেলফ, বাস্‌কেট (ঝুড়ি), চামড়ার জিনিস, মাটির জিনিস, খেলনা, হাতে তৈয়ারি কাগজ, প্লাস্টিক, এ্যালুমিনিয়মের জিনিস, কাঠের নানারকম সৌখিন জিনিস প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

প্রসিদ্ধস্থান : হাওড়া নদীর তীরে অবস্থিত **আগরতলা** রাজধানী ও প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। এখানে রাজভবন, প্রাক্তন মহারাজাদের

প্রাসাদ ও অনেক স্মৃতিচিহ্ন আছে। **চম্পকনগরে** রেশম উৎপাদন-কেন্দ্র ও উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয় আছে। **অরুন্ধতীনগরে** শিল্প-শিক্ষাকেন্দ্র, কৃষিখামার ও গবেষণাকেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছে।

উদয়পুর গোমতী নদীর তীরে অবস্থিত। একসময়ে ইহা ত্রিপুরার রাজধানী ছিল। এখানকার **ত্রিপুরেশ্বরীর মন্দির** হিন্দুদের



ত্রিপুরেশ্বরীর মন্দির

পবিত্র পীঠস্থান। এখানে একটি বড় মৎস্য-চাষকেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছে। সোনামুড়ার **রুদ্রসাগরে** মৎস্য-চাষের সুব্যবস্থা আছে। **কমলপুর** মহকুমা-শহর ও ব্যবসায়-বাণিজ্য কেন্দ্র। **ধর্মনগর** একটি প্রধান ব্যবসায়-বাণিজ্য কেন্দ্র। অমরপুরের **তীর্থমুখ** হিন্দুদের তীর্থস্থান। **কৈলাশহরে** পাহাড়ের গায়ে খোদিত দেব-দেবীর মূর্তি আছে।

বাংলাদেশ

সূচনা

১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের ১৪ই আগস্ট ভারতবর্ষের অংশ হইতে পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্ট হয়। ইহা দুই অংশে বিভক্ত ছিল—ভারতের পূর্বে পূর্ব-পাকিস্তান এবং পশ্চিমে পশ্চিম-পাকিস্তান।

উভয় অংশের শাসনকার্য পরিচালনা করিত পশ্চিম পাকিস্তান। এই শাসন-ব্যবস্থায় পূর্ব-পাকিস্তানে গভীর অসন্তোষ দেখা দেয়। পরিশেষে ১৯৭১ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে পূর্ব-পাকিস্তান স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং ঐ বৎসর ডিসেম্বর মাসে স্বাধীন বাংলাদেশ-এর সৃষ্টি হয়। পশ্চিম-পাকিস্তান এই নূতন রাষ্ট্রের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়াছে।

সীমা ও আয়তন

বাংলাদেশের উত্তরে পশ্চিমবঙ্গ ও মেঘালয় ; দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর ; পূর্বে আসাম, ত্রিপুরা রাজ্য ও মিজোরাম এবং পশ্চিমে পশ্চিমবঙ্গ। আয়তন ৫৫·১৩ হাজার বর্গমাইল (১·৪৩ লক্ষ বর্গ কি-মি.)।

বিভাগ ও জেলাসমূহ

বাংলাদেশে বর্তমানে ৩টি **বিভাগ** ও ১৯টি **জেলা** আছে। যথা—(১) ঢাকা বিভাগ ও ইহার ৬টি জেলা—ঢাকা, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, ফরিদপুর, বরিশাল ও পটুয়াখালি। (২) চট্টগ্রাম বিভাগ ও ইহার ৫টি জেলা—চট্টগ্রাম, পার্বত্য-চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, ত্রিপুরা ও শ্রীহট্ট। (৩) রাজসাহী বিভাগ ও উহার ৮টি জেলা—রাজসাহী, দিনাজপুর, রংপুর, পাবনা, বগুড়া, কুষ্টিয়া, যশোহর ও খুলনা।

প্রথম অধ্যায়

প্রথম পাঠ

ভূ-প্রকৃতি

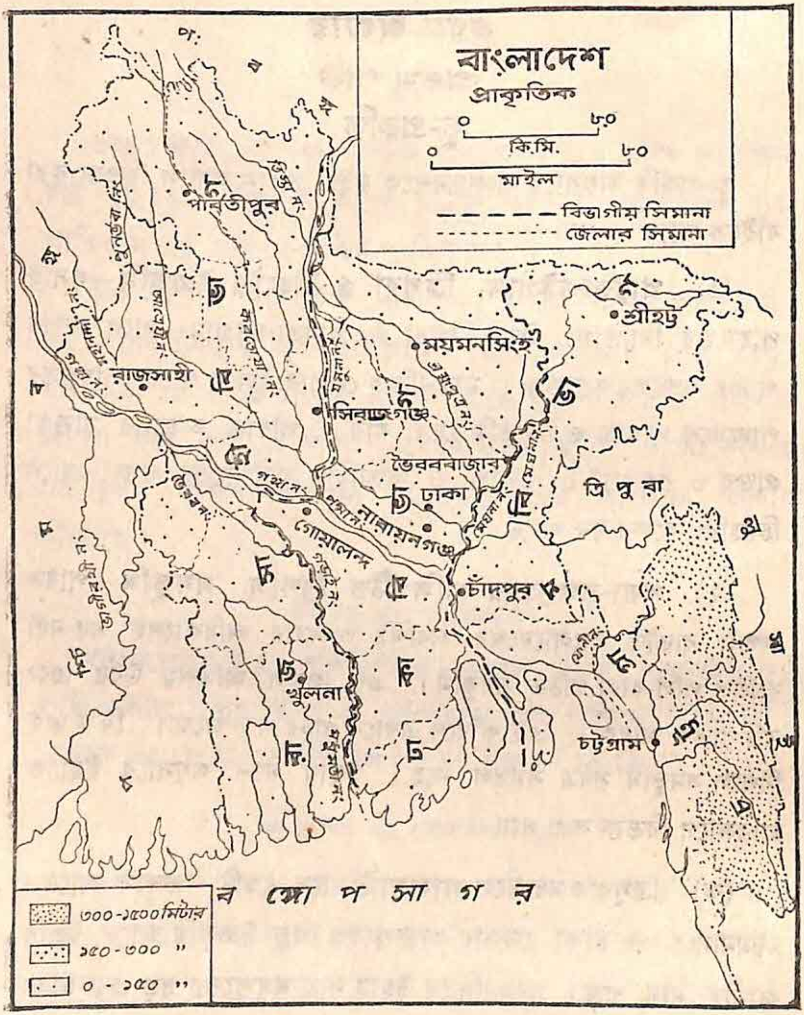
ভূ-প্রকৃতি অনুসারে বাংলাদেশকে দুইটি প্রধান অঞ্চলে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা—

(১) **পার্বত্য-চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা ও শ্রীহট্টের উচ্চভূমি**—লুসাই পাহাড়ের নিম্নভাগ, উত্তর ত্রিপুরা ও পার্বত্য-চট্টগ্রাম—বাংলাদেশের পার্বত অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। ময়মনসিংহ জেলার উত্তরে গারো পাহাড়ের পাদদেশে পাহাড় ও উচ্চভূমি দেখা যায়। পাহাড় অঞ্চলের মৃত্তিকা প্রস্তর ও কঙ্করপূর্ণ। উত্তাপ ও অত্যধিক বৃষ্টিপাতের জন্য এখানে চিরহরিৎ বৃক্ষের বন আছে।

(২) **পদ্মা-ব্রহ্মপুত্রের পলিগঠিত বিশাল সমভূমি**—পার্বত অঞ্চল ব্যতীত বাংলাদেশের অবশিষ্ট অঞ্চলের অধিকাংশই নদ-নদী বাহিত পলি দ্বারা গঠিত সমভূমি। এই অঞ্চল অতিশয় উর্বর এবং বৃষ্টিপাতও অধিক। এই কারণে এখানে প্রচুর শস্য জন্মে। কিন্তু এই বিশাল সমভূমি সর্বত্র সমতল নহে। ইহার গঠন অনুসারে ইহাকে চারিভাগে বিভক্ত করা যায়।

(ক) ত্রিপুরার মধ্যস্থলে **লালমাই** নামে একটি উচ্চভূমি আছে। ময়মনসিংহ ও ঢাকা জেলার অভ্যন্তরেও কিছু উচ্চভূমি আছে, উহার স্থানীয় নাম গড়। ময়মনসিংহে উহার নাম **মধুপুরের গড়** এবং ঢাকা জেলায় ইহাকে বলে **ভাওয়ালের গড়**।

(খ) পদ্মা নদীর উত্তরে এবং যমুনা নদীর পশ্চিমে রাজসাহী বিভাগে **বরেন্দ্র** উচ্চভূমি। তিস্তা, করতোয়া, আত্রেয়ী প্রভৃতি নদী



এই অঞ্চলের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। এখানকার ভূমি বহুকাল পূর্বে পলি-মাটি দ্বারা গঠিত হইয়াছে।

(গ) সমভূমির দক্ষিণাংশে **নূতন ব-দ্বীপ অঞ্চল**। পদ্মা, যমুনা ও মেঘনা এই অঞ্চলের উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছে। নূতন পলিমাটি দ্বারা গঠিত বলিয়া এই অঞ্চল যথেষ্ট উর্বর।

(ঘ) দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব **উপকূলের নিম্ন সমভূমি**—খুলনা জেলার দক্ষিণ সীমান্ত হইতে চট্টগ্রাম জেলার দক্ষিণ সীমান্ত পর্যন্ত এই সমভূমি বিস্তৃত। পূর্ব উপকূলের ভূমি অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত কিন্তু দক্ষিণ উপকূলের ভূমি অপ্রশস্ত ও বিশেষভাবে ভগ্ন। উপকূলের মৃত্তিকা লবণাক্ত। এখানে বহু ছোট বড় খাঁড়ি ও দ্বীপ দেখা যায়! কুতুবদিয়া, হাতিয়া, সন্দীপ, ভোলা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য দ্বীপ।

দ্বিতীয় পাঠ

নদ-নদী

গঙ্গা নদীর মূল প্রবাহ **পদ্মা** নামে দক্ষিণ-পূর্বে প্রবাহিত হইয়া গোয়ালন্দের নিকট ব্রহ্মপুত্রের প্রধান শাখা **যমুনা** নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। এই দুইটি নদীর মিলিত প্রবাহ পদ্মা নামে দক্ষিণ-পূর্বে প্রবাহিত হইয়া চাঁদপুরের নিকট **মেঘনা** নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। **ব্রহ্মপুত্র নদ** রংপুর জেলার কুড়িগ্রামের নিকট বাংলাদেশে প্রবেশ করিয়াছে। পরে উহা ময়মনসিংহ শহরের পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত হইয়া ঢাকা জেলার মুন্সীগঞ্জের নিকট মেঘনার সহিত মিলিত হইয়াছে। পদ্মা, যমুনা ও মেঘনা—এই তিনটি নদীর মিলিত প্রবাহ মেঘনা নামেই বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে। এই নদীর মোহানায় বৃহৎ **খাঁড়ি** আছে।

পদ্মার উপনদী সমূহের মধ্যে **মহানন্দা** ও উহার উপনদী **পুনর্ভবা** এবং শাখানদী সমূহের মধ্যে **ভৈরব, গড়াই** (দক্ষিণাংশের নাম

মধুমতী), **আড়িয়ালখাঁ** প্রভৃতি প্রধান। **তিস্তা**, **আত্রেয়ী**, **করতোয়া** প্রভৃতি যমুনার উপনদী। অন্যান্য নদী সমূহের মধ্যে **কর্ণফুলী**, ফেনী, নবগঙ্গা, **কপোতাক্ষ**, হরিণঘাটা, তেঁতুলিয়া, **ধলেশ্বরী** প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

বাংলাদেশের নদীগুলি নৌবাহনযোগ্য। নদীগুলির সাহায্যে দেশের অভ্যন্তরে বাণিজ্য ও যাতায়াত চলে। বর্ষাকালে নদীগুলিতে প্রবল বন্যা হয়। সেই সময় পদ্মা ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে।

তৃতীয় পাঠ

জলবায়ু

বাংলাদেশ মৌসুমী জলবায়ুর অন্তর্গত। এই দেশে গ্রীষ্মকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত এবং শীতকালে স্বল্প বৃষ্টিপাত হয়। ইহা ছাড়া, শীত ও গ্রীষ্মে তাপের পার্থক্য ১০°—১২° ফা. (৫·৫°—৬·৬° সে.)-এর বেশী হয় না। সুতরাং জলবায়ু **উষ্ণ ও আর্দ্র**। গ্রীষ্মকালে বঙ্গোপসাগর হইতে জলীয় বাষ্প বহন করিয়া **দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু** এই দেশে প্রচুর বারিবর্ষণ করে। কোন অঞ্চলেই বাষিক বৃষ্টিপাত ১৩০ সে-মি.-এর কম নহে। শ্রীহট্ট জেলার লালখেল-এ সর্বাপেক্ষা বেশী (বাষিক ৪০৬ সে-মি.) এবং রাজসাহী জেলার লালপুরে সর্বাপেক্ষা কম (বাষিক ৪৭ সে-মি.) বৃষ্টিপাত হয়। ঢাকায় বাষিক বৃষ্টিপাত ২৫৪ সে-মি., চট্টগ্রামে বাষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রায় ৩০০ সে-মি.। সমভূমি অপেক্ষা পার্বত অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বেশী। এই দেশে গ্রীষ্মে **কালবৈশাখী** এবং শরতের শেষে **আশ্বিনের ঝড়** হয়। চট্টগ্রাম জেলার **কক্সবাজার** সমুদ্রতীরবর্তী স্বাস্থ্যকর স্থান এবং **রাঙ্গামাটি** পার্বত্য-চট্টগ্রামের স্বাস্থ্যকর শৈলাবাস।

চতুর্থ পাঠ

অধিবাসী

বাংলাদেশের অধিবাসিগণের মধ্যে অধিকাংশই মুসলমান। হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান প্রভৃতি ভিন্ন ধর্মাবলম্বীর লোকও এখানে বাস করে। তাহারা সংখ্যায় অল্প। ইহা ছাড়া, ত্রিপুরা ও পার্বত্য চট্টগ্রামে কিছু সংখ্যক পাহাড়ী উপজাতীয় লোক বাস করে। **মগ, টিপ্‌রা, চাক্‌মা, নাগা, কুকী** প্রভৃতি পাহাড়িয়া জাতি বহুকাল পূর্বে মণিপুর, মিজোরাম, নাগাভূমি হইতে আসিয়া বর্তমানে এই দেশের নাগরিক হইয়া বাস করিতেছে। ইহাদের প্রধান ভাষা মণিপুরী। ইহারা বৌদ্ধ।

বাংলাদেশের লোকসংখ্যা সাড়ে সাত কোটি। প্রতি কিলোমিটারে জনবসতির ঘনত্ব ৫৩১ জন। এই দেশের অধিবাসীরা বাঙ্গালী বলিয়া পরিচিত। তাঁহাদের মাতৃভাষা বাংলাই দেশের রাষ্ট্রভাষা।

খাদ্য ঃ এই দেশ সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা। উর্বর সমভূমিতে প্রচুর পরিমাণে ধান্য উৎপন্ন হয়। তাই বাঙ্গালীদের প্রধান খাদ্য **ভাত।** অন্যান্য খাদ্য ডাল, তরকারী, মাছ প্রভৃতি এখানে সহজলভ্য। নদীতে নানারকম মাছ ধরিবার খুব সুবিধা আছে। ইহা ছাড়া, দক্ষিণাংশে উপকূলের খাঁড়িগুলিতে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। পদ্মার **ইলিশ মাছ** বাঙ্গালীদের প্রিয় ও উপাদেয় খাদ্য। বাঙ্গালীরা ভাত, ডাল, রুটী, নানারকম তরকারী ও মাছ খাইতে অভ্যস্ত। যাহাদের অবস্থা ভাল তাহারা ভাত, ডাল, মাছ ব্যতীত দধি, ঘি, মাখন, দুগ্ধ, মাংস, ডিম ইত্যাদি প্রত্যহ আহার করিয়া থাকে।

পোশাক ঃ বাঙ্গালী মুসলমানেরা সাধারণত লুঙ্গি, পায়জামা, সার্ট, পাঞ্জাবী, ফতুয়া প্রভৃতি পরিধান করে। শহরাঞ্চলে শিক্ষিত

বাঙ্গালী মুসলমানের বেশীরভাগ কোট, প্যান্ট, পায়জামা, পাঞ্জাবী ও উহার উপরে হাতকাটা কোট এবং চাদর ব্যবহার করে। মাথায় কেহ কেহ ফেজ টুপি ব্যবহার করে, আবার কেহ কেহ কোন টুপিই ব্যবহার করে না। শিক্ষিতা স্ত্রীলোকেরা সাধারণত শহরাঞ্চলে কোন বোর্‌খা ব্যবহার করে না।

বাড়িঘর ঃ বাংলাদেশের শহরের বাড়িঘর বেশীর ভাগই পাকা। কয়েকতল-বিশিষ্ট ভিন্ন ভিন্ন ধরনের পাকা বাড়ি ঢাকা ও অন্যান্য শহরে দেখা যায়। চট্টগ্রাম শহরে পাহাড়ের উপর বাংলোগুলি দেখিতে খুব সুন্দর। সাধারণ গৃহস্থের বাড়িঘর বেশীর ভাগই মাটির বা বাঁশের বেড়ার দেওয়াল, খড় বা টিনের ছাউনি দিয়া তৈয়ারি হইয়াছে। বাড়িগুলি একতলা বা দোতলা হয়। চাষী বাড়িতে গোলাঘর, হাঁস-মুরগীর ঘর, গোয়ালঘর ও খড়ের গাদা দেখা যায়।

উপজীবিকা ঃ বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের প্রধান উপজীবিকা **কৃষিকার্য**। কৃষিকার্য ব্যতীত অনেক লোক নানারকম শিল্পকার্যে নিযুক্ত আছে। গ্রামের লোকেদের মধ্যে কেহ কেহ মৎস্য শিকার ও মৎস্য ব্যবসায়, কেহ কেহ গবাদি পশুপালন, হাঁস-মুরগী পালন, ডিম ও মাংস বিক্রয়, আবার কেহ কেহ কুটীর শিল্পের কাজ, কেহ কেহ মাঝি-মাল্লার কাজ করে। শহরাঞ্চলের লোকেরা বিভিন্ন অফিসে, ব্যাঙ্কে, স্কুলে ও কলেজে চাকরি করে, কেহ কেহ ব্যবসায়-বাণিজ্য করে, কেহ কেহ শিল্পকার্যে নিযুক্ত আছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

উৎপন্ন দ্রব্য

প্রথম পাঠ

অরণ্য সম্পদ

বাংলাদেশে পার্বত্য-চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট, সুন্দরবন ও মধুপুরে বনভূমি দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল বনে চিরহরিৎ ও পর্ণমোচী-বৃক্ষ দেখা যায়। পার্বত্য-চট্টগ্রামে **দেবদারু, ঝাউ, শাল, সেগুন, গর্জন, জারুল, পোমা, বাঁশ, বেত, অশ্বত্থ** ইত্যাদি বৃক্ষ জন্মে। মধুপুর জঙ্গলে **গজারী** নামে শালগাছ জন্মে। সুন্দরবন অঞ্চলে **সুন্দরী, গরাণ, গেঁউয়া** প্রভৃতি বৃক্ষ প্রচুর জন্মে। দক্ষিণে সমুদ্র উপকূলে **নারিকেল, সুপারি ও তালগাছ** বিস্তর জন্মে। বনভূমির মূল্যবান কাঠের দ্বারা প্যাকিং বাক্স, আসবাবপত্র ও দিয়াশলাই তৈয়ারি হয়। জ্বালানি কাঠ এই সকল গাছ হইতে পাওয়া যায়। সুন্দরবনে **গোলপাতা** ও **হোগ্লা** জন্মে। জলার গাছ হইতে পাটি, মাতুর এবং হোগ্লা দিয়া ঘরের বেড়া, চাটাই ইত্যাদি তৈয়ারি হয়। জলার ফুল **শাপ্লা** বাংলা-দেশের জাতীয় ফুল। সুন্দরবনে মধু ও মোম পাওয়া যায়। এই বনে বাঘ, হরিণ ইত্যাদি জন্তু আছে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে বানর ও অনেক হাতী আছে।

কৃষি সম্পদ ঃ বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। এই দেশের অধিকাংশ স্থানেই প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। বাংলাদেশের জলবায়ু উষ্ণ ও আর্দ্র। এই দেশের বেশীর ভাগ পলিমাটি-গঠিত সমভূমি। উর্বর সমভূমি কৃষিকার্যের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। সুতরাং বাংলাদেশের কৃষিকার্য

বিশেষ উন্নত। এই দেশে নানাপ্রকার শস্য প্রচুর পরিমাণে জন্মে। কৃষিসম্পদের মধ্যে **ধান** ও **পাট**ই প্রধান। পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক **পাট** এই দেশে জন্মে এবং ইহার অধিকাংশই কাঁচামাল হিসাবে সরকার বিদেশে রপ্তানি করিয়া বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেন। ময়মনসিংহ, ঢাকা, রাজসাহী, রংপুর, পাবনা, ফরিদপুর প্রভৃতি জেলায় নদীর চরে ও ব-দ্বীপ অঞ্চলের নিম্নভূমিতে প্রচুর পাটের চাষ হয়। দোআঁশ ও পলিমাটিতে পাটের চাষ বেশী হয়।

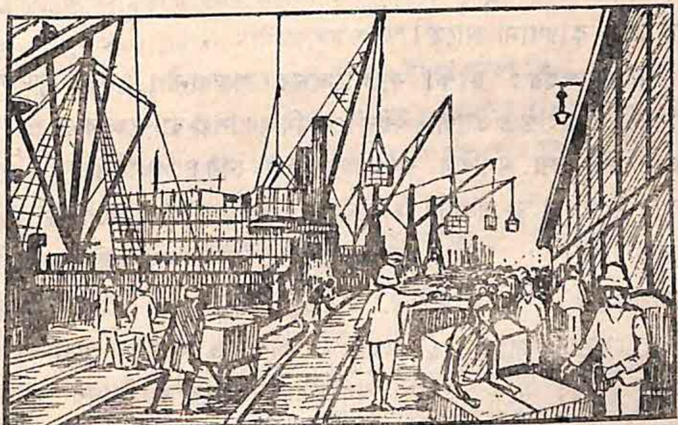
ধান এই দেশের প্রধান খাদ্য শস্য। আমন, আউশ ও বোরো এই তিন প্রকার ধান এই দেশে প্রচুর জন্মে। কুষ্টিয়া, রাজসাহী, পাবনা, ফরিদপুর ও যশোহরে কিছু **গমের** চাষ হয়। ধানের চাষ প্রায় সর্বত্রই হইয়া থাকে। রবিশস্যের মধ্যে মুগ, মসূর, মটর প্রভৃতি **কলাই** প্রচুর উৎপন্ন হয়। অন্যান্য ফসলের মধ্যে তিসি, তিল, সরিষা প্রভৃতি **তৈলবীজ** অপেক্ষাকৃত উচ্চভূমিতে এবং **ইক্ষু**, **তামাক**, লঙ্কা, **পান** ইত্যাদি সমভূমিতে জন্মে। পার্বত্য চট্টগ্রামে, শ্রীহট্টে ও উত্তর ত্রিপুরায় **চা** উৎপন্ন হয়। শ্রীহট্টে **কমলালেবু** ও **আনারস** হয়।

খনিজ সম্পদ ঃ বাংলাদেশের খনিজ সম্পদের পরিমাণ খুবই অল্প। শ্রীহট্টে কিছু **চুনাপাথর** ও কিছু লিগ্‌নাইট (বাদামী রঙের কয়লা) এবং চট্টগ্রামেও কিছু নিকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লা পাওয়া যায়। সমুদ্র উপকূলে কিছু লবণ তৈয়ারি হয়। এই দেশে খনিজ তৈলের সন্ধান চলিতেছে।

দ্বিতীয় পাঠ

শিল্প-সম্পদ

বাংলাদেশে প্রচুর কাঁচামাল আছে। কিন্তু শিল্প গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ-শক্তি, কয়লা ও খনিজ তৈলের অভাব বশত এখানে বৃহদায়তন শিল্প বিশেষ প্রসার লাভ করে নাই। বাংলাদেশে ৪২টি পাটের কল, ২২টি বড় কাপড়ের কল, ৭টি চিনির কল, ১টি কাগজের কল, ১টি সিমেন্টের কারখানা, ২৮টি এ্যালুমিনিয়ম কারখানা আছে। কুষ্টিয়া, নারায়ণগঞ্জ, খুলনা, বাগেরহাট প্রভৃতি স্থানে **পাট ও কাপড়ের কল** আছে। গোপালপুর (রাজসাহী), ময়মনসিংহ, দর্শনা (কুষ্টিয়া),



চট্টগ্রাম বন্দর

সিতাবগঞ্জ (দিনাজপুর) প্রভৃতি স্থানে **চিনির কল,** শ্রীহট্টের ছাতকে **সিমেন্টের কারখানা** ও চট্টগ্রামের চন্দ্রঘোনা-নামক স্থানে **কাগজের কল** আছে। চট্টগ্রাম জেলার পাহাড়তলীতে ও রংপুর জেলার সৈয়দপুরে **রেলওয়ে-কারখানা** আছে। এই দেশের অভ্যন্তরে রেলপথ, জলপথ ও বিমানপথের সাহায্যে যাতায়াত ও পরিবহনের সুব্যবস্থা

থাকায় শিল্পের উন্নতির যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। কর্ণফুলী নদীর তীরে অবস্থিত **চট্টগ্রাম** বাংলাদেশের প্রধান বন্দর।

বাংলাদেশ কুটীর শিল্পের জন্য বিখ্যাত। এই শিল্পের মধ্যে ঢাকা, টাঙ্গাইল (ময়মনসিংহ), ফেণী (নোয়াখালি), বাগেরহাট (খুলনা), প্রভৃতি স্থানের **তাঁতের কাপড়,** ইসলামপুরের (ময়মনসিংহ) কাঁসা-পিতলের বাসন, যশোহরের হাড়ের ও ঢাকার **শাঁখের জিনিস** এবং রংপুরের কার্পেট বিখ্যাত। ইহাছাড়া, চামড়ার জিনিস, সোনা-রূপার অলঙ্কার, মোজা, গেঞ্জি, সাবান, তৈল, সিগারেট, বিস্কুট, ছাতা, ছাতার বাঁট, মাদুর, বেতের ঝুড়ি ইত্যাদি নানারকম শিল্প-কার্যের জন্য অনেক ছোট ছোট কারখানা আছে।

প্রসিদ্ধ শহর ঃ ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানী। ইহা বুড়ীগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত প্রাচীন শহর এবং বিবিধ শিল্প-বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল। এক সময়ে সূক্ষ্ম মস্‌লিন কাপড়ের জন্য ঢাকা জগদ্বিখ্যাত ছিল। ঢাকার নবাব-বাড়ি, রমনার কালীবাড়ী, বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকেশ্বরী মন্দির প্রভৃতি বিখ্যাত। ঢাকার অনতিদূরে শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে অবস্থিত **নারায়ণগঞ্জ** পাট, তৈলবীজ, চামড়া, শিমুল তূলা প্রভৃতির শিল্প-বাণিজ্য কেন্দ্র। **রাজসাহী** পদ্মাতীরে অবস্থিত বিভাগীয় প্রধান নগর। **খুলনা** ভৈরব নদের তীরে অবস্থিত রেলওয়ে ও স্টীমার স্টেশন। ইহার নিকটবর্তী **চালনা** বৃহৎ নদী বন্দর। সুরমা নদীর তীরে অবস্থিত **শ্রীহট্ট** জেলার সদর শহর। ইহা চুন, চা ও **কমলালেবুর** জন্য বিখ্যাত। যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত **সিরাজগঞ্জ** এবং **গোয়ালন্দ চাঁদপুর** ও **ভৈরববাজার** বিখ্যাত ব্যবসায়-কেন্দ্র। **পার্বতীপুর** দিনাজপুর জেলায় অবস্থিত একটি বিখ্যাত রেলওয়ে জংশন স্টেশন। **ময়মনসিংহ** ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে অবস্থিত। ইহা জেলার সদর স্টেশন।

পরিশিষ্ট

বিবিধ অনুশীলনী

পশ্চিমবঙ্গ

প্রথম অধ্যায়

১। সমতলভূমি ও পার্বত অঞ্চলের বাড়িঘর পৃথক কেন? এই দুই অঞ্চলের বাড়িঘরের বর্ণনা কর।

২। পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণাঞ্চলের লোকেরা সূতী বস্ত্র বেশী ব্যবহার করে কিন্তু উত্তরের পার্বত অঞ্চলের অধিবাসীরা পশমের জামা-কাপড় ব্যবহার করে। এইরূপ পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যতিক্রমের কারণ কি?

৩। সমতল ভূমিতে লোকবসতি বেশী হইবার কারণ কি?

৪। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের গ্রামের বাড়িঘরের বর্ণনা দাও।

৫। বাঙ্গালীর খাদ্য কি কি? কিভাবে তাহার খাদ্যদ্রব্য সংগৃহীত হয়, বর্ণনা কর।

৬। পশ্চিমবঙ্গের গ্রামের লোকজন কি ধরনের পোশাক ব্যবহার করে? শহরের অধিবাসীদের পোশাক কিরূপ? বাঙ্গালীর জাতীয় পোশাক বলিতে কি বুঝ?

৭। পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদের উপজীবিকা কিরূপ তাহা আলোচনা কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

১। পশ্চিমবঙ্গের ভূ-প্রকৃতি বর্ণনা কর।

২। মাটি বলিতে কি বুঝ? মাটির কিভাবে উৎপত্তি হইয়াছে?

৩। মাটি কয় প্রকার? পাললিক-মৃত্তিকা কাহাকে বলে? মাটি মানুষের পক্ষে প্রয়োজনীয় কেন?

৪। পশ্চিমবঙ্গের কোন্ অঞ্চলের মাটি কি রকম? কোন্ কোন্ মাটিতে কি রকমের ফসল জন্মে?

৫। পশ্চিমবঙ্গের পলিগঠিত সমভূমিকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়? প্রত্যেক ভাগের মাটির বিষয়ে কি জান?

৬। পলিমাটিকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়? উহাদের নাম কর। কিরূপ মাটিতে ধান, ইক্ষু ও পাট জন্মে?

৭। পশ্চিমবঙ্গের প্রধান প্রধান নদ-নদীর নাম কর এবং উহাদের গতিপথ বর্ণনা কর। নদীগুলির দ্বারা এই রাজ্যের কি উপকার হয়?

৮। জলবায়ু বলিতে কি বুঝ? পশ্চিমবঙ্গের জলবায়ু কিরূপ তাহা বর্ণনা কর। এই জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য কি?

৯। পশ্চিমবঙ্গের কোন্ অঞ্চলে বৃষ্টিপাত কম এবং কোন্ অঞ্চলে বৃষ্টিপাত বেশী? কোন্ অঞ্চলে শীত ও গ্রীষ্ম বেশী নয়? দার্জিলিং-এ অধিক বৃষ্টিপাত হয় কেন?

১০। পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি স্বাস্থ্যকর স্থানের নাম কর।

১১। 'কালবৈশাখী' ও 'আশ্বিনের ঝড়' কাহাকে বলে?

তৃতীয় অধ্যায়

১। পশ্চিমবঙ্গের কোন্ কোন্ অংশে বন আছে? উহাদের নাম কর। ঐ সকল বনে কি কি গাছ জন্মে? এই রাজ্যের বনে কোন্ কোন্ জন্তু দেখা যায়?

২। কিরূপ জলবায়ুতে পশ্চিমবঙ্গের বনভূমির সৃষ্টি হইয়াছে? বনের কোন্ কোন্ বৃক্ষের কাষ্ঠ ও কোন্ কোন্ পশু মানুষের কাজে লাগে?

৩। কিপ্রকার মাটি ও জলবায়ু ধান ও পাট-চাষের অনুকূল? কোন্ কোন্ জেলায় ইহাদের চাষ বেশী হয়?

৪। চা কোথায় বেশী জন্মে? পৃথিবীর সর্বোৎকৃষ্ট চা কোথায় হয়? কি প্রকার জমি ও জলবায়ু চা-চাষের পক্ষে অনুকূল?

৫। লাক্ষা ও সিঙ্কোনার চাষ কোথায় কোথায় হয়? লাক্ষা ও সিঙ্কোনা কোন্ কাজে লাগে?

৬। নিম্নলিখিত কৃষিজাত দ্রব্যগুলি কোথায় উৎপন্ন হয়?
ধান, পাট, চা, তামাক, আলু, তৈলবীজ, কমলালেবু।

চতুর্থ অধ্যায়

১। পশ্চিমবঙ্গে কোন্ কোন্ পশু প্রতিপালিত হয়? উহারা মানুষের কি কি উপকারে আসে?

২। গবাদি পশু হইতে মানুষের কি কি প্রয়োজনীয় দ্রব্য পাওয়া যায়?

৩। পশ্চিমবঙ্গে পশুর পরিচর্যা তেমন ভালো না হইবার কারণ কি?

৪। পশ্চিমবঙ্গে কি কি মাছ পাওয়া যায়? কোন্ মাছের চাহিদা বেশী?

৫। জেলেরা কিভাবে মাছ ধরে? গভীর সমুদ্রে মাছ-ধরার কিরূপ ব্যবস্থা আছে?

৬। পশ্চিমবঙ্গে মাছের অভাব কেন? কিরূপে সেই অভাব পূরণ করা যাইতে পারে? বড় বড় কয়েকটি মৎস্য-শিকার কেন্দ্রের নাম কর।

পঞ্চম অধ্যায়

১। পশ্চিমবঙ্গের প্রধান খনিজ দ্রব্যের নাম কর। উহা কোন্ কোন্ কাজে ব্যবহৃত হয়।

২। পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি খনিজ দ্রব্যের নাম কর। ফায়ার-ক্লে ও কেওলিন কোথায় কোথায় পাওয়া যায়? উহারা কি প্রয়োজনে লাগে?

৩। পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি প্রধান প্রধান শিল্পের নাম কর। ঐগুলি কোন্ কোন্ জায়গায় এবং কি কি সুবিধা পাইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে?

৪। দুর্গাপুরে একটি বৃহৎ শিল্পকেন্দ্র গড়িয়া উঠিবার কারণ কি? এখানে কি কি দ্রব্য উৎপন্ন হয়?

৫। রেল-ইঞ্জিন নির্মাণ, রেলগাড়ি মেরামত এবং জাহাজ মেরামত পশ্চিমবঙ্গের কোন্ কোন্ জায়গায় হয়? কাগজ প্রস্তুতের কারখানা কোথায় কোথায় আছে?

৬। চা-শিল্পের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৭। নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে কোন্ কোন্ শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে ?

বাটানগর, বাঁশবেড়িয়া, পলাশী, রিষড়া, রূপনারায়ণপুর, বার্নপুর, রাণীগঞ্জ, টিটাগড়, ইছাপুর, কৃষ্ণনগর, বিষ্ণুপুর, ঝালদা, সোদপুর।

৮। পশ্চিমবঙ্গের কুটীর শিল্পগুলির নাম কর। কোন্ কোন্ জায়গায় রেশম, পশম, তসর বস্ত্র, মাটির পুতুল, শাখের জিনিস, কাঁসা পিতলের বাসন ও বেতের মোড়া তৈয়ারি হয় ?

৯। পশ্চিমবঙ্গের ২টি লৌহ ও ইস্পাত শিল্পকেন্দ্র, ২টি পাট শিল্পকেন্দ্র, ২টি রেশম শিল্পকেন্দ্র ও ২টি তাঁত শিল্পকেন্দ্রের নাম কর।

ত্রিপুরা

১। ত্রিপুরার ভূ-প্রকৃতি বর্ণনা কর।

২। ত্রিপুরার কয়েকটি প্রধান নদীর নাম কর।

৩। ত্রিপুরায় কোন্ কোন্ সময়ে বেশী বৃষ্টিপাত হয় ? কোন্ কোন্ স্থানে বৃষ্টিপাত বেশী হয় ?

৪। ত্রিপুরার অধিবাসীদিগের খাদ্য, পোশাক-পরিচ্ছদ, বাসগৃহ, জীবিকা ইত্যাদি বিষয়ে সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

৫। নিম্নলিখিতগুলি কি ? বুঝাইয়া দাও—

(ক) জুম চাষ, (খ) রিয়া ও পাছড়া, (গ) রিয়াং, (ঘ) টঙঘর, (ঙ) লুঙ্গা।

৬। ত্রিপুরার বনভূমিতে কি কি বৃক্ষ জন্মে ? বনভূমিতে কি কি জীবজন্তু ও পাখী দেখা যায় ?

৭। ত্রিপুরার কৃষি সম্পদ বর্ণনা কর। রবারের চাষ কোথায় হইতেছে ?

৮। ত্রিপুরার কয়েকটি কুটীর শিল্পজাত দ্রব্যের নাম কর। কুটীর শিল্পের উন্নতির কারণ কি ?

৯। ত্রিপুরায় বৃহৎ শিল্প গড়িয়া উঠে নাই কেন ? আদিবাসীদের তাঁত-শিল্পের কার্য সম্বন্ধে যাহা জান বল।

১০। আগরতলা, রুদ্রসাগর, উদয়পুর, তীর্থমুখ, চম্পকনগর ও অরুন্ধতীনগর কোথায় এবং কেন বিখ্যাত ?

বাংলাদেশ

১। বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি বর্ণনা কর।

২। বাংলাদেশের প্রধান প্রধান নদ-নদীর নাম কর ও উহাদের গতিপথ বর্ণনা কর।

৩। বাংলাদেশের জলবায়ু বর্ণনা কর।

৪। বাঙ্গালীদের পোশাক, খাদ্য, বাড়িঘর ও উপজীবিকা সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৫। বাংলাদেশের অরণ্যে কি কি গাছ জন্মে? গাছগুলি ঐ দেশের মানুষের কি কি কাজে ব্যবহৃত হয়?

৬। বাংলাদেশের প্রধান প্রধান কৃষিজাত দ্রব্যের নাম কর।

৭। বৃহৎশিল্প বাংলাদেশে গড়িয়া উঠে নাই কেন? পাটের কল, কাপড়ের কল, চিনির কল, কাগজের কল ও সিমেণ্টের কারখানা কোন্ কোন্ স্থানে আছে?

৮। বাংলাদেশের ২টি বড় দ্বীপ, ১টি বন্দর, ১টি পাট শিল্পকেন্দ্র, ২টি বস্ত্র শিল্পকেন্দ্র, ১টি চিনি-শিল্পকেন্দ্রের নাম কর।

৯। নিম্নলিখিত শহরগুলি কোথায় অবস্থিত এবং কি কারণে বিখ্যাত? ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজসাহী, খুলনা, শ্রীহট্ট, নারায়ণগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, পার্বতীপুর, ময়মনসিংহ।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নাবলী

[নমুনা স্বরূপ কতকগুলি নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন নির্বাচিত করিয়া নিম্নে দেওয়া হইল। শিক্ষকগণ ইচ্ছানুযায়ী গুণের দিক হইতে প্রশ্নগুলির মানোন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও সংযোজন করিতে পারেন]

পশ্চিমবঙ্গ

১। নীচে বামদিকে কতকগুলি বিবরণ ও ডানদিকে প্রত্যেক বিবরণের তিনটি উত্তর দেওয়া হইল। সঠিক উত্তরটির নীচে দাগ দাও :—

(ক) বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য	রুটি, ভাত, ছাতু।
(খ) পশ্চিমবঙ্গের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য	গম, আলু, ধান।
(গ) বাঙ্গালীদের জাতীয় পোশাক	ধুতি-পাঞ্জাবী, প্যান্ট-সার্ট, পায়জামা-কুর্তা।
(ঘ) সুন্দরবন অঞ্চলের অধিবাসীদের বাড়িঘর নির্মাণের উপাদান	পাথর, মাটি, কাঠ।
(ঙ) তন্তুবায় বা তাঁতীরা তৈয়ারি করে	হাড়ি, গামছা, কাটারি।
(চ) সূত্রধর বা ছুতারেরা তৈয়ারি করে	মশারি, কলসী, চেয়ার।
(ছ) কর্মকার বা কামারেরা তৈয়ারি করে	প্রতিমা, আসবাব, কাঁচি।
(জ) যাহারা মাছ ধরিয়া জীবিকা নির্বাহ করে তাহাদিগকে বলা হয়	পুরোহিত, জেলে, কসাই।
(ঝ) পাহাড় অঞ্চলের গরীব লোকেরা বেশী খায়	ভাত, দুধ, ভুট্টা।
(ঞ) নেপালী, ভুটিয়া, লেপচা প্রভৃতি উপজাতির বাসস্থান	ঝাড়গ্রাম, দার্জিলিং, বীরভূম।

২। এক কথায় উত্তর দাও :—

(ক) যাহাদের মাতৃভাষা বাংলা তাহাদিগকে কি বলা হয় ?

(খ) যাহারা চাষ-আবাদ করে তাহাদিগকে কি বলা হয় ?

(গ) যাহারা যজমানী করে তাহাদিগকে কি বলা হয় ?

(ঘ) যাহারা মাটির পুতুল, প্রতিমা ইত্যাদি তৈয়ারি করে তাহাদিগকে কি বলা হয় ?

৩। শূন্য স্থান পূরণ কর :—

(ক) বেশী বৃষ্টিপাতের জন্য তরাই অঞ্চল — এবং —।

(খ) মেদিনীপুরের সমুদ্রোপকূলে অনেক — আছে।

(গ) পশ্চিমবঙ্গ ভারতের অন্তর্গত একটি —।

(ঘ) ভাগীরথীর দক্ষিণ অংশের নাম—।

(ঙ) কাঁসাই-এর শেষাংশের নাম — নদী।

(চ) শীতকালে দার্জিলিংএ — হয়।

(ছ) গ্রীষ্মকালে অপরাহ্নে পশ্চিমবঙ্গে ঝড় হয়, ইহাকে বলে —।

(জ) বাঁকুড়া জেলায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ—।

(ঝ) শীতকালে যে বায়ু পশ্চিমবঙ্গের উপর দিয়া বহিয়া যায় তাহার নাম —।

(ঞ) পশ্চিমবঙ্গের জলবায়ু — ও —।

(ট) —গাছের বন আছে বলিয়া ইহার নাম সুন্দরবন।

(ঠ) দামোদর — নদীতে পড়িয়াছে।

৪। নিম্নলিখিতগুলির মধ্যে বিজাতীয় শব্দটির নীচে দাগ দাও :—

(ক) পাইন, ফার, দেবদারু, লাক্ষা।

(খ) বেলেমাটি, দোআঁশ মাটি, আমন, এঁটেল মাটি।

(গ) বাঘ, চিতাবাঘ, নেকড়েবাঘ, সম্বর।

(ঘ) গম, আলু, মেস্তা, কলাই।

(ঙ) সরিষা, তিল, তিসি, সিঙ্কোনা।

(চ) গর্জন, মধু, জারুল, ছাতিম।

(ছ) পাট, তুলা, মেস্তা, তামাক।

(জ) নারিকেল, কলা, কমলালেবু, গালা।

৫। শুদ্ধ বক্তব্যের পাশে 'হাঁ' কথাটি এবং অশুদ্ধ বক্তব্যের পাশে 'না' কথাটি লিখ।

(ক) বাঘ, চিতাবাঘ, ভালুক প্রভৃতি জন্তুর সহিত মানুষের মধুর সম্পর্ক।

(খ) বলদ এবং ঘোড়া গাড়ি টানে।

(গ) মেষের লোম হইতে রেশম তৈয়ারি হয়।

(ঘ) পশুখাদ্যের অভাবে গবাদি পশু দুর্বল হইয়া যাইতেছে।

(ঙ) হরিণঘাটায় মৎস্যশিকার কেন্দ্র আছে।

(চ) রুই, কাতলা, ইলিশ মাছ বাঙ্গালীদের প্রিয় খাদ্য।

(ছ) বাংলাদেশ হইতে ইলিশ মাছ আমদানি করিলে পশ্চিমবঙ্গে মাছের ঘাটতি কিছুটা পূরণ হইবে।

(জ) সমুদ্রের অগভীর জলে নানারকম মাছ পাওয়া যায়।

৬। বামদিকের বিবরণগুলির সঠিক উত্তর ডানদিকের বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া শব্দগুলি হইতে বাছিয়া লইয়া উহার নীচে দাগ দাও :—

(ক) পশ্চিমবঙ্গে কয়লার খনি আছে	(রাণীগঞ্জে, মেদিনীপুরে, বীরভূমে)
(খ) পাটের কল আছে	(খড়্গপুরে, নৈহাটীতে, বিষ্ণুপুরে)
(গ) লৌহ ও ইস্পাত শিল্প কেন্দ্র	(শ্রীরামপুর, দুর্গাপুর, বোলপুর)
(ঘ) কার্পাস বয়ন শিল্প কেন্দ্র	(দুর্গাপুর, বার্নপুর, সোদপুর)
(ঙ) কাগজ-শিল্প কেন্দ্র	(পানিহাটী, টিটাগড়, খড়দহ)
(চ) চিনি-শিল্প কেন্দ্র	(সোদপুর, শ্রীরামপুর, আহমদপুর)
(ছ) তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র	(বালী, বহরমপুর, দুর্গাপুর)

(জ) তাঁত বস্ত্রের জন্য প্রসিদ্ধ (মেদিনীপুর, মালদহ, বেগমপুর)

(ঝ) রেশম বস্ত্র প্রস্তুত হয় (রাণীগঞ্জে, মুর্শিদাবাদে, কাশীপুরে)

(ঞ) জুতা নির্মাণের কারখানা আছে (বাটানগরে, ব্যাণ্ডেলে, ইছাপুরে)

৭। বামদিক ও ডানদিকের মিল বুঝিয়া বামদিকের সংখ্যাটি ডানদিকের বন্ধনীতে বসাও ঃ—

(১) ছুরি কাঁচির জন্য বিখ্যাত	(ক) কৃষ্ণনগর	[ ]
(২) মাটির পুতুলের জন্য বিখ্যাত	(খ) কাঞ্চননগর	[ ]
(৩) বন্দুক ও গোলা তৈয়ারি হয়	(গ) ঝালদায়	[ ]
(৪) গালা তৈয়ারি হয়	(ঘ) কাশীপুরে	[ ]
(৫) কোক চুল্লী আছে	(ঙ) খিদিরপুরে	[ ]
(৬) জাহাজ মেরামতের কারখানা আছে	(চ) দুর্গাপুরে	[ ]

৮। অশুদ্ধ শব্দ বা শব্দগুচ্ছ কাটিয়া দাও ঃ—

(ক) নীচের শিলাস্তরের উপর আবরণ সৃষ্টি করে অপসৃত মৃত্তিকা/অবশিষ্ট মৃত্তিকা।

(খ) পার্বত অঞ্চলের মাটির রং লাল/ধূসর।

(গ) অবশিষ্ট মৃত্তিকার নীচেকার কঠিন স্তরকে বলে মালভূমি/অন্তর্ভূমি।

(ঘ) পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমাংশের ভূমি সমতল/অসমতল।

(ঙ) সমুদ্র উপকূলের মাটি কর্দমাক্ত/কঙ্করময়।

(চ) শশা, তরমুজ প্রভৃতি ফসল ভাল হয় বেলেমাটিতে/এঁটেল মাটিতে।

(ছ) গঙ্গা নদীর উত্তরদিকের ভূমিভাগের নাম রাঢ়/বরেন্দ্র।

(জ) শাল, সেগুন প্রভৃতি সরলবর্গীয় বৃক্ষ/পর্ণমোচী বৃক্ষ।

(ঝ) পলিমাটি খুব উর্বর/অনুর্বর।

(ঞ) অন্তর্ভূমি দেখা যায় ছোটনাগপুরে/মেদিনীপুরে।

ত্রিপুরা

১। ডানপাশের সঠিক শব্দটি লইয়া বাম পাশের শূন্য স্থান পূরণ কর :—

(ক) আগরতলায়—বন্দর আছে।
(খ) —ত্রিপুরার প্রধান নদী।
(গ) দুই টিলার মধ্যবর্তী সমতলভূমির নাম—।
(ঘ) তীর্থমুখের নিকটে— জলপ্রপাত আছে।
(ঙ) — বেশী বৃষ্টিপাতের স্থান।

ধর্মনগর, লুঙ্গা, ডম্বুর, বিমান, গোমতী।

১। অশুদ্ধ শব্দটি/শব্দগুলি কাটিয়া দাও :—

(ক) টিলার উপরে আদিবাসীরা দালান-কোঠায়/টঙঘরে বাস করে।
(খ) ত্রিপুরার প্রধান খাদ্যশস্য গম/ধান।
(গ) পাহাড়ে ধাপ কাটিয়া আদিবাসীরা জুম চাষ/টেরেস চাষ করে।
(ঘ) আদিবাসীদের মধ্যে অধিকাংশই রিয়াং/ত্রিপুরী।
(ঙ) লুসাইদের মধ্যে বেশীর ভাগই বৌদ্ধ/খ্রীস্টান।

২। বামদিকে ও ডানদিকের মিল বুঝিয়া বামদিকের সংখ্যাটি ডানদিকের বন্ধনীতে বসাও :—

(১) পাহাড় অঞ্চলের বনভূমিতে জন্মে	(ক) চা [ ]
(২) ত্রিপুরার বনভূমিতে দেখা যায়	(খ) বড়মুড়া [ ]
(৩) চাষের উজ্জ্বল সম্ভাবনা আছে	(গ) ধনেশ [ ]
(৪) পাহাড়ে খনিজ তৈল পাইবার সম্ভাবনা আছে	(ঘ) তাঁত [ ]
(৫) ত্রিপুরার প্রধান শিল্প	(ঙ) রবার [ ]
(৬) ত্রিপুরার বিখ্যাত কুটীর-শিল্প	(চ) নাগেশ্বর [ ]

৩। উপযুক্ত স্থানটির নীচে দাগ দাও :—

(ক) ত্রিপুরার প্রধান নদী (মুহুরী, গোমতী, হাওড়া)
(খ) ত্রিপুরা শিল্পের জন্য বিখ্যাত (কুটীর, চা, ইস্পাত)
(গ) রেশম উৎপাদন কেন্দ্র আছে (অরুন্ধতীনগরে, কমলপুরে, চম্পকনগরে)
(ঘ) ত্রিপুরার রাজধানী (ধর্মনগর, আগরতলা, সোনামুড়া)

বাংলাদেশ

১। শূন্যস্থান পূরণ কর :—

(ক) ময়মনসিংহের অভ্যন্তরে উচ্চভূমির নাম —।

(খ) মহানন্দা — উপনদী।

(গ) — সর্বাপেক্ষা কম বৃষ্টিপাত হয়।

(ঘ) চট্টগ্রাম জেলার — স্বাস্থ্যকর স্থান।

(ঙ) — বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা।

(চ) —মাছ বাঙ্গালীদের প্রিয় খাদ্য।

(ছ) বাংলাদেশের শিক্ষিতা মেয়েরা শাড়ীর উপরে — ব্যবহার করেন না।

২। এক কথায় উত্তর দাও :—

(ক) বাংলাদেশের জাতীয় ফুল কি? (খ) গোলপাতা কোথায় জন্মে? (গ) বাংলাদেশের প্রধান খাদ্যশস্য কি? (ঘ) কমলালেবু কোথায় বেশী উৎপন্ন হয়? (ঙ) চুনাপাথর কোথায় পাওয়া যায়? (চ) চট্টগ্রামের চন্দ্রঘোনায় কিসের কল আছে? (ছ) কোথাকার শাঁখের জিনিস বিখ্যাত? (জ) খুলনার বন্দরের নাম কি?

৩। শুদ্ধ বক্তব্যের পাশে "হাঁ" শব্দটি এবং অশুদ্ধ বক্তব্যের পাশে "না" শব্দটি লিখ :—

(ক) কর্ণফুলীর ইলিশমাছ বিখ্যাত।

(খ) চটগ্রাম শহর বুড়ীগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত।

(গ) বাংলাদেশ শিল্পপ্রধান দেশ।

(ঘ) সুন্দরবনে দেবদারু গাছ বেশী জন্মে।

(ঙ) পার্বত্য চট্টগ্রামে চা উৎপন্ন হয়।

(চ) নারায়ণগঞ্জে চিনির কল আছে।

(ছ) বাগেরহাটের তাঁতের কাপড় বিখ্যাত।

(জ) সিরাজগঞ্জ মেঘনা নদীর তীরে অবস্থিত।

(ঝ) ব্রহ্মপুত্রের প্রধান শাখা যমুনা

(ঞ) দিনাজপুরে সিমেন্টের কারখানা আছে

EASTERN PUBLISHERS